যাদুপুরী

যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

প্রকাশক
ইণ্ডিয়ান্ পাবলিশিং হাউস
২২/১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

প্রকাশক

দেবকুমার বসু

ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস

২২/১, বিধান সরণী

কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদ শিল্পী

পূর্ণজ্যোতি ভট্টাচার্য

চিত্র-শিল্পী

বীত পাল

মুদ্রাকর

এন. কে. মিত্র

ইণ্ডিয়ান্ প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড

[illegible], লেনিন সরণী, কলিকাতা-১৩

●

'যাদুপুরী'র কথা বলিতে গেলে প্রথমেই মনে পড়ে—নানা দেশের রূপকথার কত বরণ মালা, উপন্যাস, পুরাণ, কাহিনী, নৃত্য-গীত, কতনা মরু-প্রান্তর, মহারণ্যের বিভীষিকা,—কোথায় কোন্ অজ্ঞাত মরু-প্রান্তরের বুকে কবে কার কোন্ রাজার বাড়ী, ভগ্ন জীর্ণ দেওয়াল ঘেরা লতাগুল্মজালে আচ্ছন্ন ভাঙ্গা সোপান। কে জানে কবে কোন্ রাজারকুমার রাজারকুমারী এ-অজ্ঞাত অঞ্চলে বেঁধেছিল ঘর। কোথায় তারা? কোথায় কোন্ সাগরপারের অজানা দ্বীপের বিরাট পাহাড়ের বুকে কে রাখিয়াছে চিহ্নিত করিয়া বিরাট পদচিহ্ন। ইংরাজী গল্পে পড়ি 'There are devil's footprints all over the world, a mark in some rock resembling a huge footprint.' এ-বিষয়ে কতনা Folk Tales and Legends-এর প্রবাদ চলিতেছে।

কোথায় তুষারধবল হিমালয়ের নিভৃত বুকে গিরিশিখরের চূড়ায় নিবিড় গুহার অন্তরালে বাস করে তুষার-মানব—কয়েক বৎসর হইতে হিমালয় অভিযানকারীদের কাছ হইতে তুষারমানবের পদচিহ্ন, তাহাদের আকৃতি প্রকৃতি ও গঠন আচার ব্যবহার সম্বন্ধেও কত কথা জানিতে পারিতেছি। এই যে অজানা সুদূর পর্ব্বত ও গুহার প্রাণী, তাহাদের নাম দেওয়া হইয়াছে এতি (Yeti) তিব্বতীয়েরা তাদের অভিধানে নাম দিয়াছে ড্রেড্‌মো (Dredmo)। তারা বন্যমানুষ হয়ে জন্মালে কি হবে, এরা হল বর্ব্বর—"Though born a human being he has grown an impious savage: a wildman: a savage." ইহাদের ইতিহাস বলিতে গেলে বলিতে হয়, 'অর্দ্ধেক সত্য আর অর্দ্ধেক কাহিনী।' অনেকে একটি জীবিত তুষারমানব দেখিয়াছেন গণ্ডেন লুমার চিড়িয়াখানায়, ১৯৫৪ সালের তিব্বতের এক ভীষণ বর্ষা ও বন্যার প্রভাবে যে তুষার মানবের মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া সংবাদে প্রকাশ' অনেকে আবার তুষারমানবের জীবিত অবস্থায় দেখিয়াছিলেন। ইহারা উচ্চতায় ৬২ ফিট! এমনি কত কি যে আছে এই পৃথিবীর গিরি-পর্ব্বতে, নদী-সাগরে - এ বিপুল বিশ্বের কতটুকু জানি!

মহাশূন্য বিজয় অভিযানে ও চলিয়াছে মানবযাত্রী, কয়েকটি স্বয়ংক্রিয় ভূপার্থিব রকেটের স্থাপিত স্পুটনিক বা রকেট চলিয়াছে মহাশূন্যে বিজয় অভিযানে! কোথায় চন্দ্র, কোথায় তারা, শুক্র মঙ্গল, শনি একদিন হয়ত দুনিয়ার মানুষ সেখানেই করিবে অভিযান.........তাহাদের বাসস্থান।

একজন বিদেশী লেখকের কয়েকটি কথা অতি সুন্দর। তিনি লিখিয়াছেন—**Every man and boy sees himself in the outlaw, identifies himself with that fearless, physical prowess, coolness and nerve swept gun play, hard riding, and the quick thinking and acting**.........এসব বিপ্লবী, দুঃসাহসী নির্ভীক তরুণ দলই নবীন জগতের অভিযাত্রী—তারাই করে নূতনের অভিযান, তারাই মৃত্যুকে বরণ করিতে ভয় পায় না লাফিয়ে পড়ে সমুদ্রেব অতলে, রকেটে চড়ে যেতে চায় চন্দ্রলোকে ইতর প্রাণীর মত তারাও জীবন-মৃত্যু তুচ্ছ করিয়া তারা সব নূতন পথে চলে। ভয় করেনা, বিপদ মানেনা-নিষেধ মানেনা—অজানার সন্ধানে চলে--করে তারা নূতন আবিষ্কার!

'যাদুপুরী' রহস্যোময় উপন্যাস। ......যে পুরীর যাদু উদ্ধারের জন্য এক তরুণ কিশোরের কিরূপ সাহস ও সংযমের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। তাহা পড়িতে পড়িতে কিশোর অভিযানকারীরা কতনা কাহিনী জানিতে পারিবে! এ-বইয়ে যেভাবে গল্পটি লেখা হইয়াছে, তাহা সব দিক তরুণ প্রাণ নব নব আবিষ্কারের আনন্দে ও উৎসাহে উল্লসিত হইবে। কল্যাণীয়া স্নেহ-ভাজনীয়া শ্রীমতী গৌরী ঘোষ এম· এ· আমার এ-বইয়ের প্রুফ-সংশোধনে সাহায্য করিয়াছেন--সেজন্য তাহাকে আমি আশীর্বাদ করি।

চম্পক কুটির
বসুনগব, পোঃ মধ্যমগ্রাম
জিলা, ২৪ পরগণা
জন্মাষ্টমী—৯ই ভাদ্র
বুধবার—১৩৬৬
২৬শে আগষ্ট—১৯৫৯

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

হে কিশোর, তুলে লও তোমার উদয় জয় ভেরী
করহ আহবান।
আমরা দাঁড়াবো উঠি,' অথবা ছুটিয়া বাহিরিব,
অর্পিব পরাণ!
চাবোনা পশ্চাতে মোরা, মানিবনা বন্ধন ক্রন্দন,
হেরিবনা দিক্,
গণিবনা দিনক্ষণ, করিবনা বিতর্ক বিচার
উদ্দাম পথিক।

—রবীন্দ্রনাথ



—এক—

অদ্ভুত চিঠি

হাওড়া ষ্টেসন হইতে বোম্বে মেল ছাড়িবার অল্প কয়েক মিনিট বাকী। ষ্টেসনে ভয়ানক ভিড়। যাত্রীদের ছুটাছুটি,—ফেরিওয়ালাদের হাঁকডাক, মুটেদের সঙ্গে বচশা, হ-য়ে সে এক বিচিত্র কোলাহল চলিতেছে। এমন সময় রজত তাড়াতাড়ি একটি মধ্যম শ্রেণীর গাড়ীর কামরায় প্রবেশ করিল। সঙ্গে ছিল তাহার একটি ছোট সুটকেস্ আর একটি ছোট বিছানা। সৌভাগ্যক্রমে গাড়ীতে তখনও তেমন লোক হয় নাই। একজন মাড়োয়ারি ভদ্রলোক বেঞ্চের এক পাশে বিছানা পাতিয়া শুইয়া যায়গা দখল করিয়াছিলেন। রজত তার সুটকেস্‌টি উপরের বাঙ্কে রাখিয়া দিল এবং ছোট বিছানাটি বেঞ্চের এক কোণে পাতিয়া, নিশ্চিন্ত মনে দরোজার পাশে চুপ্ করিয়া বসিয়া লোক-চলাচল দেখিতে লাগিল। এ যাত্রী কোলাহল ও তাহাদের ব্যস্ততা দেখিতে তাহার বেশ লাগিতেছিল।

রজত কলিকাতার একটি ইংরাজী স্কুলে পড়ে। সেখানকার বোর্ডিংয়ে থাকে। ছেলেবেলা হইতেই সাহেব-মেমদের স্কুলে ও বোর্ডিংয়ে থাকার দরুন সে বেশ স্মার্ট। ইংরাজীতে অনর্গল কথা বলিতে পারে। পোষাক-পরিচ্ছদ ও ইংরাজ বালকদেরই মত। পথ চলিতে সে সতর্ক ও অভ্যস্ত। শীতের ছুটীতে সে বরাবর বাবা-মার

কাছে বোম্বাই যায়। সেখানে তাহার বাবা, মা ও বোনেরা থাকে। তার বাবা ডক্টর অসিতবরণ সেন অর্থাৎ কিনা ডক্টর সেন সেখানে একজন নাম করা ডাক্তার। ছ্বটিতে সে বাবা-মার কাছে চলিয়াছে কাজেই তার মন আনন্দে প্র্ণ। তবে এবার পরীক্ষার ফলটা ভাল হয় নাই, পাছে বাবার বক্বনি খাইতে হয়, সে ভয়টাও মাঝে মাঝে মনের মধ্যে উঁকি-ঝ্বঁকি দিতেছিল। ঢং ঢং ঢং করিয়া গাড়ী ছাড়িবার শেষ ঘন্টা পড়িল। এঞ্জিনের বাঁশী বাজিল। গাড়ী আস্তে আস্তে প্লাটফর্ম ছাড়িয়া চলিতে স্বর্ব করিল।

গাড়ী চলিতেছে, এমন সময় হঠাৎ গাড়ীর দরজাটা খ্বলিয়া গেল এবং একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক হাতে একটি চামড়ার স্বটকেশ ও ডান হাতে গাড়ীর হাতল ধরিয়া গাড়ীতে উঠিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। রজত এই বৃদ্ধ ভদ্রলোকের এইর্প বিপন্ন অবস্থা দেখিয়া তাড়াতাড়ি তাঁহার ডান হাতখানি শক্ত করিয়া ধরিয়া তাঁহাকে গাড়ীর ভিতর টানিয়া ত্বলিল। ভদ্রলোক গাড়ীতে ঢ্বকিয়া পাশের বেঞ্চটার উপর বসিয়া হাঁপাইতে লাগিলেন। তাঁহার হাত হইতে স্বটকেস্‌টা ছিট্‌কাইয়া পড়িয়াছিল। রজত সেটি সযত্নে বাস্কের উপর রাখিয়া দিল।—সে মনে মনে ভাবিতে লাগিল—আর একট্ব হলেই হয়েছিল আর কি! একেবারে গাড়ীর চাকার তলে পড়ে পিষে যেত। গাড়ী ষ্টেসন ছাড়াইয়া তখন চল্লিশ মাইল বেগে ছ্বটিতে আরম্ভ করিয়াছে।

রজত বৃদ্ধের পাশে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল: আপনার কোথাও লাগেনিত!

বৃদ্ধ ভদ্রলোক গাড়ীর ভিতরকার চারিদিকে নজর করিয়া দেখিতে লাগিলেন, যে সত্য সত্যই তিনি গাড়ীর ভিতরে রহিয়াছেন কিনা। তারপর রজতের কথার উত্তরে বলিলেন: না তেমন কিছ্ব লাগেনি। আমার এমন ভাবে তাড়াতাড়ি গাড়ীতে উঠ্‌বার চেষ্টা করাটাই অন্যায় হয়েছে—বিশেষ এই ব্বড়ো বয়সে, কিন্তু গাড়ীটা ষ্টেশনে রয়েছে এক্ষ্বনি ছেড়ে দিবে এমন সময় গাড়ী মিস্‌ করাটাও যেন কেমন কেমন ঠেক্‌লো, তাই এই অন্যায় সাহস করেছিলাম। উঃ তোমায় অজস্র ধন্যবাদ, না—না আশীর্ব্বাদ কচ্ছি এমনি করে বিপন্নের উপকার করতে ভ্বলো না।

বৃদ্ধের পরনে কালো রঙের সুট্। পেন্ট কোট সকলেরই রঙ কালো। টুপিটি তিনি খুলিয়া রাখিয়াছিলেন। মাথায় মস্ত বড় টাক। টাকের দুই পাশ দিয়া পাকা লম্বাচুল রুপালি রেশমের মত ঝুলিয়া পড়িয়াছে। দাড়ি, গোঁফ কামান। রঙটি বেশ ধবধবে শাদা। কোটের দুই দিকে বড় বড় দুইটি পকেট। হাতের



রজত বৃদ্ধ ভদ্রলোককে বিপন্ন অবস্থা দেখিয়া গাড়ীতে টানিয়া তুলিল......

আঙ্গুলগুলি লম্বা ও শীর্ণ। গলার চামড়া ঝুলিয়া পড়িয়াছে। বৃদ্ধ কয়েক মিনিটের মধ্যেই বেশ নিশ্চিন্ত হইয়া বেঞ্চের উপর বসিলেন।

রজতও এইবার তাহার বেঞ্চের এক কোণে বিছানার উপর বসিয়া সুটকেস হইতে একখানি বাঙ্গালা গল্পের বই বাহির করিয়া পড়িতে সুরু করিল। তাহার বাবা বলিয়াছিলেন: ইংরাজীই পড় বা শিখ, কিন্তু মাতৃভাষা বাঙ্গালার দিকে মন রেখো সকলের উপর, বাঙ্গালা বই পড়ো। রজত সে কথা ভোলে নাই। সে ছেলেমেয়েদের বাঙ্গালা গল্পের বই ও মাসিক পত্রিকা পড়িতে খুবই ভালবাসে। ইংরাজী মাসিকের মধ্যে তার প্রিয় ছিল—**'The Boys Own Paper'** এবং **'Wireless Monthly',**—সে অতি ছেলেবেলা হইতেই নানা কল-কব্জা, বাড়ীঘর, মোটরগাড়ী, রেলের এঞ্জিন সব দেশালাইর বাক্স, পোষ্টকার্ড ও পেষ্টবোর্ড ইত্যাদি দিয়া এমন সুন্দর ভাবে তৈরী করিতে পারিত যে লোকে তাহাকে বাহবা না দিয়া পারিত না—সেদিকে রজতের ছিল একটা স্বাভাবিক প্রতিভা।

বৃদ্ধ এদিকে রজতকে বেশ লক্ষ্য করিতেছিলেন। বলিষ্ঠ সুন্দর চেহারা। ফুটফুটে গায়ের রঙ। মাথাভরা কালো কোঁকড়ান চুল। নাক মুখ সুগঠিত। চোখ দুটি বেশ। চোখের তারকা কালো ও বড়। স্বাভাবিক ভাবেই তাহার মুখে একটি দিব্যশ্রী ফুটিয়া রহিয়াছে। বয়স হইবে তার পনের কি ষোলো। তবু যেন রজতের মুখে একটু বিমর্ষ ভাব। বৃদ্ধের মনে হইল এই কিশোরের মন নিশ্চয়ই কোন কারণে বিষণ্ণ সেজন্য একটু বিমনা ও বোধ হইতেছে। বইয়ের পাতার দিকে বড় একটা মন নাই, সে বাহিরের দিকেই যেন কেমন একটা উদাস দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে।

বৃদ্ধ রজতকে লক্ষ্য করিয়া সহসা বলিলেন: আমি তোমার কাছে বিশেষ কৃতজ্ঞ। তুমি আমায় যদি হাত ধরে টেনে গাড়ীর উপর না তুলতে হয়ত আমি পড়ে মরে যেতুম, আর যদিই বা প্রাণে রক্ষা পেতুম তবে হাঁটু ভাঙ্গা 'দ'-হয়ে সারা জীবন না বাঁচার মত বাঁচতে হত। এই বলিয়া বৃদ্ধ একটু হাসিলেন। রজত একটু বিরক্ত হইয়া কহিল—হাঁ তা—কতকটা বটেই'ত! উত্তরটা সে এইবার তেমন ভদ্রতার সঙ্গে দিল না। আনমনা ভাবে দিল।

বৃদ্ধ আবার বলিলেন—তোমাদের স্কুল বুঝি বড় দিনের জন্য ছুটী হয়েছে, না?

হাঁ।

কালই সব স্কুলের ছুটি হয়েছে, না?

হাঁ, কালই আমাদের স্কুলের ছেলেরা সব বোর্ডিং ছেড়ে যার যার বাড়ী চলে গেছে। আমি কালই যেতাম, তবে অনেক দূরে যেতে হবে কিনা, তাই গুছুতে গাছাতে একটা দিন কলকাতা থাকতে হল।

তোমার বাবা মা কোথায় থাকেন?

বোম্বে।

কোন্ যায়গায় বলত?

গ্রান্ট রোডে, ফিরোজশা কোর্টে।

বেশ। তোমার ছুটিটা যেন আমোদে-আহ্লাদে কেটে যায়।

—ছুটি ফুরুবার আগেই আমার আবার কলকাতা ফিরে আস্‌তে হবে—পড়াশুনা করতে হবেত! এ টার্মটার রেজালট্ তেমন ভাল হয় নি।

তোমরা ক' ভাইবোন?

রজতের কাছে বৃদ্ধের এইরূপ অযাচিত আত্মীয়তার ভাবটা একেবারেই ভাল লাগিতেছিল না। রজত বিরক্ত হইয়া কহিল: তিন বোন্। আরও কি কিছু জানবার আছে আপনার? বৃদ্ধ বলিলেন: না—তবে কি না তোমার আর একটি ছোট ভাই ও নেই। রজতের মুখে বিরক্তির ভাব প্রকাশ পাইল। বৃদ্ধ বলিলেন: মেয়েরাত আর তোমার সঙ্গী হতে পারবে না, না পারবে খেলাধূলা করতে, না পারবে বেড়াতে। রজত এবার একটু উত্তেজিত হইয়া কহিল; কি বলছেন আপনি? আমার বোনেরা সব দিকেই স্মার্ট, যেমন পড়াশুনায়, তেমনি নাচে-গানে, বাজনায়, খেলা-ধূলায়, আমাদের বাড়ীতে তারা দিন রাত বাতাসের মত হেসে খেলে বেড়ায়। আমার বাবা মাকে যদি দেখতেন! কত ভালবাসেন আমাদের।

চমৎকারত! কোন খুড়তোত, মাসতুত ভাই বোন্ আর তোমার কেউ আছে কি?

রজত মনে মনে ভাবিল, তবু ভাল, বুড়ো যে জিজ্ঞেস করে

নাই যে তোমার বাবার কত বয়স, আর বোন্‌দের বয়স কত, দেখতে কেমন! গৌরবর্ণা না শ্যামলী!

বৃদ্ধ বলিলেন—বেশ লোক আমি—আমাকে তুমি মরণের মুখ হ'তে বাঁচালে, কিন্তু তোমার নামটিই এতক্ষণ জিজ্ঞেস করিনি! বুড়ো বয়সের ভুল।

আজ্ঞে রজত সেন।

তুমি কি কোনদিন রেঙ্গুনে গিয়েছিলে?

সে খুব ছেলেবেলায়। একবার মার সঙ্গে আমার দাদুর কাছে গিয়েছিলুম, সেখানকার কোন কথা আমার মনেই নেই—খুব ছোট ছিলাম কি না!

বৃদ্ধ আর কোন কথা বলিলেন না। রজতও সুযোগ পাইয়া তাহার বইএর দিকে মন দিল।

—জান, আমারও বোম্বে যাবার কথা ছিল, কিন্তু কাশীতে একটু কাজ আছে, তাই কাশীতে নেমে দু' এক দিন থেকে যাব—হাঁ, তোমার কথা আমার বরাবর মনে থাক্‌বে। খুব ভাল ছেলে তুমি। আমি আশীর্ব্বাদ করি, এমনিভাবে পরের উপকার করে জীবন ধন্য করো!

রাত্রি কাটিয়া গেল। মধুপুরে মাড়োয়ারি ভদ্রলোক নামিয়া গেলেন। গাড়ীতে রহিল মাত্র তাঁহারা দুইজন। রাত্রি বেশ আরামে ঘুমে কাটিয়া গেল। বোম্বে মেলে এমন সুযোগ বড় একটা মিলে না।

পরদিন বেলা সাড়ে নটার সময় গাড়ী মোগলসরাই ষ্টেশনে আসিয়া দাঁড়াইল। গাড়ী মোগলসরাই পৌঁছিবার আগে সকাল হইতেই মাঝে মাঝে বৃদ্ধ গাড়ীর জানালার মধ্যে দিয়া উঁকিঝুঁকি মারিয়া কি যেন দেখিতেছিলেন। চোখে মুখে একটা ব্যাকুলভাব ফুটিয়া উঠিয়াছিল। ষ্টেসনে যেমন আসিয়া গাড়ী দাঁড়াইল, অমনি তাড়াতাড়ি তিনি ষ্টেসনে নামিয়া পড়িলেন। নামিবার আগে এই অপরিচিত ভদ্রলোক একখানা আঁটা দিয়ে শক্ত করিয়া আটকানো খামে ভরা চিঠি রজতের হাতে দিয়া বলিলেন—এ চিঠিখানা বাড়ী যাবার আগে খুলো না। ভাল কাজের পুরস্কার বিধাতা দেন এ কথা সর্ব্বদা মনে রেখো। তুমি যদি আমার এ কথাটি সর্ব্বদা মেনে চল, তবে জীবনে কোন দিন কোন দুঃখ পাবে না।

বৃদ্ধ এই কথা বলিয়া দ্রুতপদে গাড়ী হইতে নামিয়া গেলেন এবং মুহূর্ত্তমধ্যে অগণিত যাত্রী দলের মধ্যে যে কোথায় মিলাইয়া গেলেন রজত আর তাঁহাকে দেখিতে পাইল না।

রজত ভাবিল—লোকটা পাগল। ভাগ্যিস্ নেমে গেল। নইলে সারা পথ বক্‌বক্ করে জ্বালাত।

গাড়ী হুস্‌হুস্ শব্দ করিয়া মোগলসরাই ষ্টেসন হইতে ছাড়িয়া দিল।—রজত খামখানির উপর নজর করিয়া দেখিল তাহার উপর—আঁকা বাঁকা মোটা অক্ষরে লেখা রহিয়াছে রজত সেন।

রজত ভাবিল কখন বৃদ্ধ চিঠি লিখিবার সময় পাইল? সম্ভবতঃ সে যখন ঘুমাইয়াছিল, তখন কোন অবসরে বৃদ্ধ তাহাকে এই চিঠিখানি লিখিয়া থাকিবে। চিঠিখানি বাড়ী পেঁŏছিবার আগে কেন যে পড়িবার জন্য বৃদ্ধ মানা করিয়া গেল—তার কারণ সে বুঝিতে পারিল না। না—চিঠিটা খুলেই দেখা যাক্ না, একবার তাহার মনে ঐরূপ ইচ্ছা হইলেও সে চিঠিখানা না খুলিয়া সযত্নে পকেটের মধ্যে রাখিয়া দিল। সে বৃদ্ধের কথার মূল্য রাখিবে। এবং মনে মনে বলিতে লাগিল—বেশ বাড়ী গিয়েই চিঠিটা সকলের কাছে পড়া যাবে—বাঃ তখন কি মজাই না হবে! —তাইত কি ভুলই না হলো, বুড়োর নামটিত জিজ্ঞাসা করা হলো না?

রজত আবার মন দিয়া গল্পের বইখানা পড়িতে সুরু করিয়া দিল।

রজত যখন বোম্বে সহরের ভিক্টোরিয়া টার্মিনাস্ ষ্টেসনে আসিয়া নামিল তখন শীতের রৌদ্রের স্বর্ণোজ্জ্বল দীপ্তিতে চারিদিক হাসিতেছিল। ষ্টেসন হইতে বাড়ী বেশী দূরে নয়। তার ছোট সুটকেসটি আর বিছানার বান্ডেলটি নিজেই হাতে ও পিঠে ঝুলাইয়া লইয়া ষ্টেসনের বাহিরে আসিল। মনে পড়িল বাড়ীর কথা। আর কয়েক মিনিট পরেই সে বাড়ী গিয়া পেঁŏছিবে—মা ও বাবার পায়ের ধূলি মাথায় লইয়া ধন্য হইবে—আর বোন্ কয়টির প্রফুল্ল কলরোলে পথের সব গ্লানি কোথায় চলিয়া যাইবে! পথ চলিতে চলিতে আবার গাড়ীর মধ্যকার সেই বৃদ্ধ ব্যক্তির কথাও তার মনে পড়িতেছিল।

বাড়ী পেঁŏছিবামাত্রই সে দেখিতে পাইল দুয়ারের পাশে



দুয়ারের পাশে দাঁড়িয়ে আছে তিনটি বোন রুণু, ঝুণু, টুণু

দাঁড়াইয়া রহিয়াছে তাহার ছোট তিনটি বোন্—রুণু, ঝুণু, টুনু চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল;—দাদা এসেছেরে, দাদা এসেছে! বোন্ তিনজনে তাহাকে ঘিরিয়া ধরিল। রজত তাড়াতাড়ি তাহার মাকে প্রণাম করিল, পরে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া তাহার সুটকেস আর বিছানার বান্ডেলটি রাখিয়া দিল।

—দুই—

চিঠির সতর্ক বাণী

মা বলিলেন, বাবুলু,—বাবুলু রজতের ডাকনাম—তুমি তাড়াতাড়ি হাতমুখ ধুয়ে কাপড় ছেড়ে চায়ের টেবিলে এস। আগে চা ও খাবার খেয়ে নাও, তারপর ভাই বোনে মিলে যত খুশি গল্প করো। এই কথা বলিয়া তিনি ঈষৎ হাস্য করিলেন। রজত লক্ষ্য করিয়া দেখিল, তাহার মা যেন একটু রোগা হইয়া গিয়াছেন। কানের দুই পাশের চুলে একটু পাকও ধরিয়াছে। রুণু রজতের কাছে কত কি বলিয়া যাইতেছিল। মা বলিলেন—রুণু, লক্ষ্মীটি দাদাকে কাপড় চোপড় ছেড়ে একটু তৈরী হতে দাও, তারপর চায়ের টেবিলে বসে, গল্প করো। তারপর রজতকে বলিলেন : বাবুলু ভেবেছিলাম, তুমি কালই আসবে! কই কালত এলে না। স্কুলের স্পোর্টের জন্য একদিন দেরী হয়ে গেল—মা। আচ্ছা এবার তাড়াতাড়ি পরিষ্কার হয়ে চায়ের টেবিলে এস।

রজত জিজ্ঞাসা করিল : কই বাবাকেত দেখতে পেলাম না! তিনি কোথায় ?

বসবার ঘরে বসে আছেন। তাঁর শরীরটা তত ভাল নয়। ব্যবসাও মন্দা ধরছে। অনেক বিলেত ফেরত নূতন ডাক্তার এসেছেন কিনা! একবার এক্ষুনি গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করে এস, তারপরে কথাবার্ত্তা হবে। তিনি চা খেয়েই হয়ত আবার বেরিয়ে যাবেন।

রজত শঙ্কিত মনে ডাক্তার সেনের বসবার ঘরে প্রবেশ করিল। এ বাড়ীর ছেলেমেয়েরা সকলেই তাঁর কাছে ভয় পায়। তার কারণ ডক্টর সেন অত্যন্ত গম্ভীর প্রকৃতির লোক। বেশী কথা বলেন না। বাড়ীতে যে সময়টুকু অবসর পান সে-টুকু তিনি নানা ডাক্তারি জার্ণেলের পাতার মধ্যে ডুবিয়া থাকেন। রজতের মনে একটা সঙ্কোচের কারণও ছিল। এবারকার পরীক্ষায় সে ভাল ফল করিতে

পারে নাই পাছে বাবা তাহাকে বকুনি দেন, এই ছিল তার আশংকা।

রজত তাহার বাবাকে প্রণাম করিয়া তাঁহার সম্মুখে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ডক্টর সেন মুখ হইতে পাইপটা একটু সরাইয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে রজতের দিকে তাকাইয়া বলিলেন:—বাড়ী এসে ভাল লাগছেত!

মাথা নীচু করিয়া রজত কহিল: আজ্ঞে হ্যাঁ। আচ্ছা বাবা, এবার আমাদের কোথাও বেড়াতে নিয়ে যাবেন না এ-ছুটীর মধ্যে।

এবার হবেনা বাবুলু। তেমন রোগী পত্র নেই। সে যাক্—তুমি তাড়াতাড়ি মুখ হাত ধুয়ে এস। চা খাবার পর যদি আমার বাইরে কোন ক'লে যেতে না হয়, তবে তোমার সঙ্গে দু' একটি কথা বলব। যাও মুখ হাত ধুয়ে এস। রজতের মনে পড়িল আগেকার বছর তাহাদের ছুটির অবসরটা মুসৌরী সহরে কি আনন্দেই না কাটিয়াছে।

রজত যখন চায়ের টেবিলে আসিল, তখন তার বেশ ভাল লাগিল। রুণু, ঝুনু, টুনু তাহার দুই পাশে বসিয়াছিল, রুণু দেখিতে খুব ফর্শা, মাথাভরা কোঁকড়ান চুল, মুখ, চোখ চমৎকার, যেন শিশির ধোয়া একটি গোলাপ ফুল। মুখে সর্ব্বদা হাসিটি লাগিয়াই আছে। বয়স তার এগারো বারো, কখনও সাড়ী পরে, কখনও বা ফ্রক। চমৎকার পিয়ানো আর হার্মোনিয়াম বাজাইতে পারে—স্কুলে তার ভাল গাইতে পারে বলিয়া খুব সুনাম, ভারি মিষ্টি গলা। ঝুণুর বয়স আট বৎসর। চোখ দুটি যেন সকল সময় হাসিতেছে। রঙ রুণুর চেয়েও একটু বেশী ফর্সা। বব্ করা চুল। এই ফ্রক পরা মেয়েটি খুব ভাল নাচিতে পারে আর আবৃত্তি করিতে পারে। টুণু আর ঝুণু শুধু দেড় বছরের ছোটবড় দেখিতেও অনেকটা এক রকমের।

মা সকলকে চা ঢালিয়া দিতেছিলেন। রুণু মাঝে মাঝে উঠিয়া খাবার প্লেটগুলি সাজাইয়া দিতেছিল। রজতের মা নীরবে কাজ করিয়া যাইতেছিলেন কথা বড় একটা বলিতেছিলেন না।

রজত প্রফুল্ল মনে চা পান করিতেছিল। দীর্ঘ ট্রেন যাত্রার এই যে বিশ্রাম, এই যে একটা সুমধুর আরাম আপনার প্রিয়জন মধ্যে সে যেন সব ক্লান্তি ও অবসাদ পলক মধ্যে দূর করিয়া দেয়। রজতের

কিন্তু গাড়ীর কথা, সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোকের দেওয়া চিঠিখানির কথা চা খাইতে খাইতে মনে হইতেছিল—কখন সে চিঠিখানি পড়িয়া জানিবে উহার মধ্যের গোপন কথা। এইরূপ কৌতূহল অন্যায় নহে তবে বাবার কাছে কি তিনি মনে করেন এজন্য সে চুপ করিয়াছিল। শুধু আভাসে এক সময়ে বোন্‌দের কাছে কথাটা বলিয়াছিল।

ডক্টর সেন ঘড়ির দিকে মাঝে মাঝে চাহিতেছিলেন। এমন সময় ট্রিরিং ট্রিরিং করিয়া টেলিফোনের ঘন্টা বাজিয়া উঠিল। ডক্টর সেন চায়ের পেয়ালাটা হাত হইতে নামাইয়া ফোনের কাছে যাইতে প্রস্তুত হইতেছিলেন, এমন সময় রুণু মিষ্টি হাসিয়া কহিল; তুমি চা খাও বাবা, আমি ফোনে কে ডাকছেন শুনে আসি। রুণু চকিতে চলিয়া গেল এবং খানিকক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল—, বাবা তোমাকে নয়টার সময় খুব তাড়াতাড়ি রস্তমজি বহরমজির বাড়ী যেতে বল্‌লেন। —ডক্টর সেন উঠিতে উঠিতে বলিলেন;—বাব্‌লু, যদি তোমার চা খাওয়া শেষ হয়ে থাকে তবে একবার আমার কনসালটিং রুমে এস। তোমার সঙ্গে গুটি দুই কথা বলেই আমি বেরিয়ে যাব।

রজত পিতার অনুসরণ করিল। ডক্টর সেন মৃদুস্বরে কহিলেন;—দেখ, রজত তোমার এ বৎসরের পরীক্ষার রিপোর্ট আমি পেয়েছি, এমন খারাপ রেজাল্ট কোনবার তোমার হয়নি, সব মাষ্টার একই ভাবে রিপোর্ট দিয়েছেন যে এ-বছরে তুমি পড়াশুনায় একেবারেই মন দাওনি। তুমি বুদ্ধিমান ছেলে, একটু মন দিলেইত বেশ ভাল করতে পারতে। দেখ, ছেলেবেলাতে পড়াশুনায় অবহেলা করাটা একেবারেই ভাল নয়। সময় কখনও ফিরে পাওয়া যায় না। কেন এমন হল বলতে পারো?

রজত ঘরের মেজেতে পাতা কার্পেটের দিকে নত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। ডক্টর সেন এতটুকু ভৎর্সনা না করিয়া তেমনি ধীরভাবে বলিলেন—তাহলে স্কুলের এ-রিপোর্টে কোন কথা অন্যায় বলা হয় নি?

এইবার রজত মৃদু কন্ঠে কহিল: হাঁ বাবা, আমি পড়াশুনায় তেমন—ডক্টর সেন রজতের দিকে তাহার দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া কহিলেন:—তুমি স্কুলে বরাবর ভাল করে এসেছ, অল্প আয়াসেই তুমি পরীক্ষায় প্রথম, দ্বিতীয় হয়েছ বলে মনে করেছিলে—তোমার

স্বাভাবিক ক্লেভারনেস্ তোমাকে সহজে পরীক্ষায় ভাল রেজাল্ট করে দিবে। এ কথাটা মনে রেখ রজত, তোমার বাবা কোন দিন কুঁড়েমি জিনিষটা পছন্দ করেন না। দেখ জিনিয়াস্ বা ক্লেভারনেস্ বলে কোন জিনিষ নেই, যে লোক পরিশ্রমী, যে লোক অধ্যবসায়ী তারাই দুনিয়াতে বড় হন, যাদের লোকে বলে জিনিয়াস্।—আমি জানি তোমার বুদ্ধি আছে—তবে সে বুদ্ধি যদি কাজে না লাগালে তবে কি করে চল্‌বে! দেখেছত আমার পশার দিন দিনই কমে আস্‌ছে—কিন্তু খরচ পত্র সব এই দুর্দিনে রোজই বেড়ে যাচ্ছে! আমিত আর তোমার মত ছেলেমানুষ নই যে মিথ্যা আশায় দিন কাটাব। এভাবে যদি সময় নষ্ট কর, তবে বড় হলে—কি কাজ করবে—কেমন করে বড় হবে? মনে রেখ তোমাকে মানুষ হতে হবে।

রজত কহিল,—বাবা, আমি অতশত কথা কোনদিন ভাবি নি। আমি ঠিক ভালভাবে পাশ করে পরে ভার্সিটিতে যাব।

ডক্টর সেন ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন: না না সে হবে না। তোমার ভার্সিটিতে যাওয়া হবে না। আমি সে খরচ চালাতে পারব না। হাঁ, তবে একথা ঠিক যে তোমাকে আমি আর এক বছর পড়বার খরচ দিব। আমি চাই তুমি মানুষ হও, এবং ভেবে দেখ, ভবিষ্যতে তুমি কি করবে, কি হতে চাও তুমি? আমি চাইনা যে লক্ষ্যহীনভাবে তুমি কেবল পড়াশুনা করে চল।

রজত দৃঢ়কন্ঠে কহিল:—আমি যে কি হতে চাই, সে যে আমি বুঝতে পারি না বাবা, কোনদিন ভাবিনিত তবে আমার কাছে এঞ্জিনিয়ারিংটাই ভাল লাগে—কিন্তু আমি যে সে সম্বন্ধেও কিছু ভাবিনি!

ডক্টর সেন দৃঢ়কন্ঠে কহিলেন—বেশকথা। জীবনের লক্ষ্য খুঁজে বের কর। জীবনে যার লক্ষ্য ঠিক্ থাকেনা, সে কোনদিন মানুষ হতে পারে না। বেশ, এ ছুটিতে যদি তোমার কোথাও বেড়াতে ইচ্ছে করে তবে যেতে পার। তোমার মার আদরে আর বোন্‌দের সঙ্গে দিনরাত হৈ চৈ করে সময় কাটানো আমার পছন্দ নয়। এ-কথা আমি স্পষ্ট করে বলে দিলুম। আচ্ছা এখন যাও। আর যেন কোনদিন তোমার সম্বন্ধে স্কুল হতে এমন খারাপ রিপোর্ট না আসে।

একথা বলিয়া ডক্টর সেন রজতের কাঁধে স্নেহভরে হাতখানি রাখিয়া ধীরে তাহাকে দরজার দিকে ঠেলিয়া দিলেন। রজত নীরবে দরজার বাহিরে চলিয়া গেল। তাহার মা তখন এই ঘরের দিকেই আসিতেছিলেন।

রজতের মা মিনতি দেবী স্বামীর দিকে শংকিতভাবে চাহিয়া বলিলেন:—তুমি রজতকে কোন গালমন্দ দাওনিত?

ডক্টর সেন একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া, তারপর মৃদু কন্ঠে কহিলেন—রজত আমাকে নিরাশ করেছে। তার বুদ্ধি আছে, কাজ করবার ক্ষমতা আছে তবু সে গেল বছর ভাল রেজাল্ট করতে পারে নি। একটু শাসনের তার দরকার আছে। —মিনতি দেবী একটি কথাও বলিলেন না। ডক্টর সেন বাহিরে চলিয়া গেলে পর তিনি ছেলেমেয়েদের কাছে আসিলেন।

রুণু, ঝুণু, টুণু তিন বোন্ এইবার রজতকে সেই চিঠিখানি বাহির করিবার জন্য ধরিয়া বসিল। মিনতি দেবী কহিলেন:— আঃ! তোমরা একটু চুপ কর। এস আমরা সবাই মিলে চায়ের টেবিলটা পরিষ্কার করে ফেলি। রুণু, ঝুণু, টুণু মায়ের সঙ্গে সঙ্গে তাড়াতাড়ি টেবিলটা পরিষ্কার করিয়া ফেলিল এবং পরে তাহারা সকলে গিয়া বসিবার ঘরে বসিল।

মা বলিলেন:—রজত, এবার ছুটিতে তোমার কোথাও বেড়াতে যাওয়া হবে না বলে দুঃখিত হচ্ছ, না? তোমার স্কুলের কোন ছেলেও বুঝি তোমাকে তাদের সঙ্গী হতে বলেনি, কেমন?

রজত বিষণ্ন ভাবে মাথা নাড়িয়া কহিল, না মা, এবার কেউ কিছু বলেনি। গেল বছর কত ইন্‌ভিটেশান্ পেয়েছিলুম কিন্তু এবার কিছুই পেলাম না। তারপর মায়ের দিকে মুখ তুলিয়া চাহিয়া কহিল:—মা তোমার একটা চেঞ্জের দরকার। শরীরটা তোমার বড় ভেঙ্গে গেছে।

মিনতি দেবী বলিলেন:—তোমার বাবা বলেছেন, আমাকে একা কোন ভাল যায়গায় থাকবার ব্যবস্থা করে দিবেন। আমি বলেছি সে হবে না, যদি কোথাও যেতে হয় তবে সব একসঙ্গে যাব। মন খারাপ করোনা বাবলু হয়ত আমাদের আবার ভাল হবে। জেন রজত, ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস করে মানুষ যদি সৎপথে চলে তবে তার

কোনদিন অমঙ্গল হয় না। হাঁ, এইবার তোমার সব কথা বল। এই বলিয়া ধীরে ধীরে তিনি রজত যে জানালার পাশে বসিয়াছিল, সে জানালাটি খুলিয়া দিলেন। সরল শিশুর হাসির মত এক ঝলক সোনার আলো ঘরের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িল।

এইবার রুণু, টুণু, ঝুণু তাহার দাদার পকেটে হাত দিয়া কহিল—বাবলু দাদা ভাই, এবার চিঠিটা পড়ে শোনাও না লক্ষীটি!

মা বলিলেন:—বেশত এবার পড়ে শোনাও কি লিখেছে সেই বুড়ো ভদ্রলোকটি।

রজত পকেট হইতে চিঠিখানি সযত্নে বাহির করিয়া পথের সেই আশ্চর্য্য কাহিনী সবিস্তারে মা ও বোন্‌দের কাছে বর্ণনা করিল। রুণু বলিল:—অদ্ভুত বটে। তোমার কি মনে হয় লোকটা পাগল?

ঝুণু কহিল আমি হলেত কেঁদেই ফেলতুম। টুণু কহিল: হাঁ, বাব্‌লুদা—সে চিঠিটা তুমি গাড়ীতে খুলে পড়নি?

টুণু রজতকে কখনও দাদা বলিত না, বাবলুদা বলিত।

রজত কহিল:—ভদ্রলোক মানা করেছেন, কি করে পড়বো বলো!

ইস্‌—তোমার যেন আর ইচ্ছে হয়নি—আমি হলেত বুড়ো যেমন নেমে গেল অমনি খুলে পড়ে ফেলতুম—এবার লক্ষ্মীটি চিঠিটা পড়না একবার। তিনবোন্‌ একসঙ্গে রজতের দিকে ঝুকিয়া পড়িল।

রজতের মা বলিলেন:—আশ্চর্য্য বটে! কিন্তু তিনি চিঠি তক্ষুনি পড়িবার জন্য রজতকে কোন কথা বলিলেন না। রুণু, ঝুণু, টুণু ও রজতকে বসবার ঘরে থাকিতে বলিয়া তিনি নিজে একবার বাহিরে আসিলেন—ভৃত্যকে বাজার করিতে পাঠাইয়া দিয়া আবার ফিরিয়া আসিলেন।

সকলে নিশ্চিন্তভাবে এইবার বসিবার ঘরে বসিলেন। মাও আসিলেন। এইবার রজত আঁটা দিয়া আঁটা এন্‌ভেলাপ খানি পকেট হইতে বাহির করিল। সকলে ব্যাকুল আগ্রহ সহকারে পত্রের মর্ম্ম জানিবার জন্য অস্থির হইয়া উঠিল। দুইজনে একসঙ্গে বলিয়া উঠিল—এইবার পড়ে ফেলনা ভাই বাব্‌লু দাদা।

মাও ধীর কন্ঠে কহিলেন—বেশ পড়।

রজত পড়িতে লাগিল। চিঠিখানি বেশ পুরু কাগজে বড় বড়

অক্ষরে লেখা। রজত পড়িতে সুরু করিবার আগে মা ও বোন্‌কে বলিল এইবার শোন। বৃদ্ধ লিখিয়াছেন:—

'আমার রেল গাড়ীতে দেখা বালক-বন্ধু!'

তুমি আমাকে রেল গাড়ীতে উঠিবার সময় যে সাহায্য করিয়াছিলে সেজন্য আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি। তাহার বদলে তোমাকে যদি কোন উপদেশ দিই—আশাকরি তুমি তাহা মানিয়া লইবে। খুব সম্ভব তুমি দুই তিন দিনের মধ্যে ব্রহ্মদেশের কোনও



রজত চিঠি পড়িতে লাগিল—বৃদ্ধ ট্রেন যাত্রী কি ভয়ানক

বিখ্যাত সহর হইতে একখানি আমন্ত্রণ লিপি পাইবে সেখানে যাইবার জন্য। তুমি সে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করো না। যদি সে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মদেশের সে সহরে বেড়াইতে যাও তাহা হইলে তুমি বিপন্ন হইবে। সাবধান! ভয়ঙ্কর বিপদে পড়িবে।

সকলে ভয়ার্ত্ত কন্ঠে কহিল—বৃদ্ধ ট্রেনযাত্রী। কি ভয়ানক!

রুণু কহিল—লোকটি কি করে জানলো যে তোমাকে কেউ ব্রহ্মদেশ থেকে নিমন্ত্রণ করবেন। সেখানে গেলেই বা বিপদ হবে কেন? বর্মাদেশে কি আমাদের জানাশোনা কি কেউ রয়েছেন? শুনিনিত। মা বলিলেন:—আশ্চর্য্য বটে! তাঁহার মুখে একটা বিস্ময়ের ও আতঙ্কের ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

রজত কহিল: আচ্ছা মা, সত্য সত্যই যদি বর্মা থেকে একটি নিমন্ত্রণ আসে—তবে কি মনে হবে না যে বুড়োর চিঠির কথা সত্যি; আমি আজ থেকে রোজ ডাকের চিঠির আশায় বসে থাকবো! দেখি পাগলা বুড়োর চিঠির মধ্যে কতটা সত্য আছে।

ঝুণু বলিল সে আর আসছে না ভাই বাবলুদা।

রজত চিঠিখানি আবার এন্‌ভেলাপে ভরিয়া পকেটের ভিতর রাখিয়া কহিল:—এমন অদ্ভূত কাহিনী জীবনে বড় একটা সত্য হয়ে দেখা দেয়না। মা আমি এই একবার বাইকে করে সহরটা বেড়িয়ে আসি।

মা বলিলেন:—তাড়াতাড়ি ফিরে এস। বেশী ঘোরাফেরা করো না।

রজত চলিয়া গেলে পর—রুণু বলিল, মা—বাব্‌লুদার ছুটিটা মাটি করে দিলে। কি যেন বাবু। কেন এমন চিঠি সে লোকটা দিলে।

মা বলিলেন:—তোমরা ওকে এ-চিঠির ব্যাপার নিয়ে আর কোন কথা তুলো না।

পরের দিন সকালবেলা ঘুম হইতে জাগিয়া রজতের মনে হইল সে যেন সম্পূর্ণভাবে নূতন জীবন লাভ করিয়াছে। একটু বেলা

হইয়াছিল। রাস্তার ধারের তালগাছের পাতার উপর সূর্যের উজ্জ্বল দীপ্তি পড়িয়া চারিদিক ঝলমল করিতেছিল। প্রভাতের পাখীদের কলরব তখনও থামে নাই। বাড়ীর পাশ দিয়া ট্রামগাড়ী ঘড়্ ঘড়্ শব্দ করিতে করিতে ছুটিয়া চলিয়াছে। রজত ঘড়ি দেখিয়া চমকিয়া উঠিল, তাইত, উঠিতে অনেক বেলা হইয়াছে—বাবা না জানি কত রাগ করিতেছেন।

এমন সময় বাহিরের বারান্দায় শোনা গেল ডক্টর সেনের গম্ভীর কন্ঠস্বর—রজত কোথায় ?

—তিন—

ব্রহ্মদেশের নিমন্ত্রণ

আজ বড় দেরি হয়ে গেল তোমার রজত। আমরা তোমার জন্য অপেক্ষা করে আছি। যখন যে কাজ করা দরকার সে কাজ ঠিক সময়ে করাই ভাল। —চলো চায়ের টেবিলে।

রজত মাথা নীচু করিয়া মৃদু স্বরে কহিল: ছুটির দিনে সে খেয়াল থাকে না বাবা।

একি একটা কথা হলো বাবলু! তোমার একার জন্যে অপরে কেন সময় মত কাজ করতে পারবে না? সাবধান! কাল যেন আর এমন দেরী না হয়।

রজত লজ্জিত হইয়া নীরব রহিল। ডক্টর সেন চা পান করিয়াই বাহিরে চলিয়া গেলেন। রজত কোনদিন কোন কাজেই অনাবশ্যক বিলম্ব করে না। কাজেই তাহার পিতার কাছে এই সামান্য বিলম্বের জন্য অভিযোগ শুনিয়া সে একটু ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িয়াছিল।

মিনতি দেবী তাহা লক্ষ্য করিয়া হাসিয়া বলিলেন: জানত বাবলু, তোমার বাবা প্রত্যেকটি কাজ ঘড়ি ধরে করেন, কোন কাজে অযথা বিলম্ব তিনি সহ্য করতে পারেন না। কাল থেকে যেন আর এমন না হয়, কেমন?

রজত একটি কথাও বলিল না। তাহার মুখে একটা বিষণ্ণভাব ফুটিয়া উঠিয়াছিল। এই দীর্ঘ ছয় সপ্তাহের ছুটীতে বাবার সতর্ক প্রহরা ও ভৎর্সনার মধ্যে থাকা যে অসম্ভব! যদি সে কোথাও বেড়াইতে যাইতে পারে তবেই হইবে তাহার এই অবকাশের পরিপূর্ণ সার্থকতা! সত্যিই যদি বার্মা হইতে কোন চিঠি আসে তবে বেশ মজাই হইবে একটা নূতন রকমের অ্যাডভেঞ্চার।

সে কাহারও সঙ্গে একটি কথাও না বলিয়া নীরবে চা পান শেষে তাহার পড়িবার ঘরে গিয়া বসিল। সুন্দর দিনটি। আকাশের

নীলিমার মধ্যে আছে এক অপূর্ব্ব উদার ভাব। কোথায় তার শেষ! পাখীরা উড়িয়া বেড়াইতেছে—স্বাধীন তারা, যেখানে ইচ্ছা উড়িয়া যাইতে পারে, কিন্তু মানুষ হইয়াও যে সে বন্দী।

ডক্টর সেন—হাসিমুখে একখানি চিঠি রুণুর হাতে দিয়া হাসিয়া কহিলেন—এ নিশ্চয়ই তোমার বন্ধু শিপ্রার চিঠি। বিলাতের চিঠির নূতন খবর তোমার কাছে শোনা যাবে। আর একখানি তাঁহার স্ত্রীর হাতে দিলেন—অপর একখানি চিঠি রজতকে দিয়া বলিলেন: এই নাও তোমার চিঠি। না জানি কোন বন্ধু তোমাকে তাঁর সঙ্গে বেড়াতে যেতে লিখেছে। তারপর সকলের দিকে চাহিয়া হাসিয়া কহিলেন—আর বাকী চিঠিপত্র কাগজ সব আমার। গাড়ীতে বসে বসে পড়বো। আজ অনেকগুলো 'কল' এসেছে ফিরতে দেরী হবে। —এই কথা বলিতে বলিতে তিনি বাহিরে চলিয়া গেলেন।

রুণু তাহার চিঠি পড়িতে পড়িতে হাসিতে লাগিল—তারপর আনন্দের সঙ্গে বলিল—শুনছো মা, শিপ্রা কি মজার কথাই না লিখেছে! লিখেছে—দিদিভাই জান! জাহাজ সব চেয়ে ভাল লেগেছিল কেন? না—জাহাজের ভেতর বেশ দুটো কালো বেড়াল ছিল। আমার সঙ্গে তারা কি মজাইনা করত। খাবার কেড়ে নিতে হাত বাড়াত!

শিপ্রা মিসেস্ সেনের মেজো বোনের মেয়ে। সে তার বাবা ও মায়ের সঙ্গে বিলাত গিয়াছে। রুণুর সঙ্গে ছিল তার খুবই ভাব। দু'জনে একসঙ্গে খেলাধুলা করত। শিপ্রা দেশে থাকিতে বিড়াল খুব ভালবাসিত। কাজেই তাহার চিঠিতে বিড়ালের এ সংবাদ পাইয়া রুণুর খুব আনন্দ হইল। রুণুর কোলে তখনও একটী ছোট বিড়াল আনন্দে ঘড়্ ঘড়্ শব্দ করিতে করিতে ঘুমাইতেছিল। এজন্য বিড়াল প্রিয় রুণু শিপ্রার চিঠিতে খুবই খুশী হইয়াছিল।

মিনতিদেবী জানালার ধারে চেয়ারখানি টানিয়া লইয়া তাঁহার নিজের চিঠিখানি পড়িতেছিলেন। রজত নিবিষ্টমনে তাহার চিঠি পড়িতেছিল।

রুণু জিজ্ঞাসা করিল: তোমায় কে চিঠি লিখেছে ভাই বাবুলদা?

রুণু খাম খানার দিকে তাকাইয়া বলিল: এ হাতের লেখা কোন দিন দেখেছি বলেত মনে হয় না।

রুণু এন্‌ভেলাপের উপর বার্মার ছাপ দেখিয়া চমকাইয়া উঠিল—একি! ওমা! এ যে বার্মার চিঠি!

রজত ধীর ভাবে কহিল, এ-একখানা ইনভিটেসান্‌ লেটার বার্মা যাবার জন্য।

তিন বোন একসঙ্গে জিজ্ঞাসা করিল: কে নিমন্ত্রণ করেছেন?

রজত হাসিয়া বলিল:—দাদুভাই!

সে কি? আমাদের দাদুভাই! কই কোন দিন তাঁর কথা শুনিনিত মা'র কাছে।

মিনতি দেবী র তের কথা শুনিয়া কাছে আসিয়া বসিলেন—এবং ব্যগ্রকন্ঠে জিজ্ঞাসা র, এ কার চিঠি রজত?

রজত প্রফুল্ল মনে মৃদুস্বরে কহিল:—আমাদের দাদুভাই! এইবার সকলে রজতকে ঘিরিয়া বসিল। রজত পড়িতে লাগিল:—

থেয়াটু, যাদুপুরী—বার্মা।

দাদুভাই, রজত! আমি সমুদ্রের ধারে আমার যে বাড়ী আছে, সেখান হতে কিছুদিনের জন্য কার্য্যোপলক্ষ্যে ঈজিপ্টে যাব। তোমার মেজ মাসীমার মেয়ে মীরা এখানে আছে। এত বড় বাড়ীতে একা থাকা তার পক্ষে সম্ভবত নয়ই বরং অনেক ভয়ের কারণও আছে। তুমি আমার চিঠি পেয়েই বার্মা চলে এস। তোমার আসবার খরচের জন্য টাকা আমি আমার বোম্বের ব্যাঙ্কে পাঠিয়ে দিয়েছি, হয়ত এ-চিঠি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ব্যাঙ্কের লোক তোমার কাছে টাকা পৌঁছে দিবে। এখানে আসতে কোন অসুবিধা হবে না তোমার। রেঙ্গুন জাহাজ পৌঁছলেই দেখ্‌তে পাবে জেটিতে তোমার জন্য আমার লোক অপেক্ষা করছে। তুমি আসবে কিনা তার করে জানিও। যদি এস তবে আমার কর্ম্মচারী তোমার জন্য অপেক্ষা করবে। সেখান থেকে পরের ট্রেনে থেয়াটুতে আমার বাড়ী পৌঁছতে

অনেকটা সময় লাগবে। কিন্তু সেজন্য কিছু ভাবনার কারণ নাই। বাড়ীর নাম **যাদুপুরী** হইলেও তোমার আশঙ্কার কোন কারণ নাই।

তোমাদের একান্ত কল্যাণকামী
দাদুভাই
করুণা শঙ্কর গুপ্ত
(K. S. Gupta)

তিন বোন্ উচ্চৈঃস্বরে কহিল: দাদুভাইএর নিমন্ত্রণ। কই কোনদিন মা তোমার মুখেত আমাদের দাদুভাইয়ের গল্প শুনি নি।

মিনতি দেবীর মুখখানি মলিন হইয়া গেল।

তিনি চুপ করিয়া রহিলেন। তাঁহার চোখের কোণে জল দেখা গেল।

রজতের এই চিঠিখানি পাইয়া আশ্চর্য্য হইবার যথেষ্ট কারণ ছিল। মা কি বাবার মুখে তাহারা কেহ কোন দিন দাদামশাইয়ের নাম শোনে নাই, কাজেই সে কিংবা তাহার বোনেরা জানিত না যে তাহাদের মার বাবা আজও বাঁচিয়া আছেন। তার কারণটা বলিতেছি। ডক্টর অসিতবরণ সেন তখন সবে মাত্র কলিকাতা হইতে ডাক্তারি পাশ করিয়া বোম্বেতে বসিয়াছেন। সে সময়ে তাঁহার দৈবাৎ মিনতি দেবীর সহিত সাক্ষাৎ হয় তখন বিখ্যাত ব্যবসায়ী মিঃ গুপ্ত কার্য্যোপলক্ষ্যে কিছু দিন যাবত বোম্বে সহরে বাস করিতেছিলেন। ডক্টর সেন ও মিনতি দেবী উভয়ে বিপত্নীক মিঃ গুপ্তের অমতে বিবাহ করিয়াছিলেন। সেজন্য কোপন স্বভাবের মিঃ গুপ্ত এই কন্যা ও জামাতার সহিত কোন সম্পর্ক রাখেন নাই। রজতের বয়স যখন চারি বৎসর মাত্র সে সময়ে হঠাৎ মিঃ গুপ্ত তাঁহার কন্যা ও জামাতার নিকট বাবলুকে তাঁহার ওখানে পাঠাইবার জন্য লিখিয়াছিলেন—রজতের বাবা ডক্টর অসিতবরণ শ্বশুরের এই প্রস্তাবের প্রতি শুধু উপেক্ষাই প্রদর্শন করেন নাই, অধিকন্তু তীব্রভাবে এইরূপ অসঙ্গত প্রস্তাবের গ্লানিসূচক পত্র দিয়াছিলেন। সেই পত্র পাইয়া মিঃ গুপ্ত অতি মাত্রায় ক্রুদ্ধ হন ফলে এ বাড়ীতে আর কেহ কোনদিন মিঃ গুপ্তের নাম করেন নাই। সে ঘটনার পর কয়েক বৎসর

কাটিয়া গিয়াছে, প্রায় দশ পনেরো, রজতের নামে তাঁহার দাদামশাইয়ের এই প্রথম পত্র আসিল।

মিঃ গুপ্তের তৃতীয়া কন্যা ইরার বিবাহ হইয়াছিল ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের মিঃ শোভন সেন ওরফে এস, সেনের সহিত। কন্যা ইরার একমাত্র মেয়ে মীরার স্বাস্থ্য ছেলেবেলা হইতেই ভাল ছিল না বলিয়া ইরা তাঁহার বারো বৎসরের কন্যা মীরাকে মিঃ গুপ্তের নিকট পাঠাইতে ইচ্ছা করেন। মিঃ গুপ্ত ইহাতে সম্মতি দিয়া কন্যা ও জামাতাকে লিখিলেন:—তোমাদের প্রস্তাবে আমি আনন্দিত হইলাম, কিন্তু আমার মনে হয় তোমাদের মেয়েটিকে সুদূর ব্রহ্মদেশে পাঠাইবার পূর্বে তাহাকে কিছুদিনের জন্য অসিত ও মিনতির ওখানে রাখিয়া দেও। তাহাদের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে থাকিলে তাহার বিদেশে থাকিবার অভ্যাসটা স্বাভাবিক হইয়া উঠিবে।

রজতের ছোট মাসীমা ইরা দেবী, পিতার প্রস্তাব অনুসারে মীরাকে বোম্বে পাঠাইয়াছিলেন।

মীরাকে বাবলুর বাবা ও মা পরম যত্নে গ্রহণ করিয়াছিলেন। রজতের বোনেরাত একজন নূতন সঙ্গী পাইয়া খুবই খুসী হইয়াছিল কিন্তু মীরা কোনরূপেই তাহাদের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া থাকিতে পারে না। সামান্য একটু কিছু হইলেই সে কাঁদিয়া ফেলিত এজন্য রজত তাহার নাম দিয়াছিল ছিঁচকাদুনি বেবি।

মিনতি দেবী প্রায় এক বৎসর কাল মীরাকে তাঁহার কাছে রাখিয়াও যখন, কোন রকমেই তাহার স্বভাবের কোন পরিবর্ত্তন করিতে পারিলেন না, তখন ডক্টর অসিতবরণ ও মিনতি দেবী ইরা দেবীর পত্র পাইয়া মীরাকে তাঁহাদের একজন আত্মীয়ের সঙ্গে ব্রহ্মদেশে পাঠাইয়া দিলেন। সে প্রায় দু' বৎসর আগের কথা। তারপর এ পরিবারের লোকেরা কেহই মীরার সম্বন্ধে আর কোনও সংবাদ পায় নাই জানিতেও চাহে নাই। এত সব খবর ডক্টর অসিতবরণ ও মিনতি দেবী সম্পূর্ণভাবে রজত ও তাহার বোনদের কাছে গোপন রাখিয়াছিলেন। কাজেই তাহারা দাদুভাইয়ের এইরূপ চিঠির দ্বারা রজতকে আহবান করার সংবাদে বিস্মিত ও আনন্দিত হইয়াছিল। মীরা আসিয়াছিল চলিয়া গিয়াছে কাজেই তাহার সম্বন্ধে কাহারও আর ততটা কৌতূহল ছিল না।

রজতের কিন্তু মীরাকে কোনদিন ভাল লাগে নাই। একি! কথায় কথায় কাঁদা অসহ্য! কাজেই বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মত সম্পূর্ণভাবে অপরিচিত দাদুভাইয়ের এই নিমন্ত্রণ সে একেবারেই প্রসন্ন মনে নিতে পারিল না। আবার সেই ছিঁচকাঁদুনি মেয়েটার সঙ্গে দেখা হইবে কি ভয়ানক! আবার রেলগাড়ীর সে বৃদ্ধের চিঠির সতর্কবাণী ও তাহাকে শঙ্কিত করিয়া তুলিল। মিনতি দেবী সহসা গম্ভীর ও বিমর্ষ হইলেন। রুণু, ঝুণু, টুণুর স্বাভাবিক প্রফুল্লতাও যেন কোথায় মিলাইয়া গেল। রজত চিঠিখানি হাতে করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

—চার—

যাত্রা পথে

আচ্ছা বাবলুদা, তোমাকে মীরার সঙ্গী করে দেওয়ার জন্য এত ব্যস্ত হলেন কেন? আমাদের কাউকে ডেকে পাঠালেইত বেশ হত। তোমাকে ডাকলেন কেন বুঝতে পারলুম না। রুণু গম্ভীর ভাবে এই কথা কয়টি বলিল।

রজত হাসিয়া বলিল: তোদের ভালবাসেন না তাই।

রুণু উত্তরে কহিল: সম্ভবতঃ তিনি ভেবে থাকবেন, আমরা বোনেরা ওকে ভালবাসতুম না! এত সঙ্গী নয়, তুমি হবে ভাই মীরার পাহারাদার—একথা বলিয়া সে হাসিতে লাগিল। আচ্ছা দাদা—দাদুভাইয়ের নিমন্ত্রণ আর সেই রেলগাড়ীতে যে একবুড়ো তোমাকে যেতে মানা করেছিলেন তার সঙ্গে কি এর কোন সম্পর্ক আছে? ঠিক্ বুঝতে পারলুম না।

এইভাবে ভাইবোনদের মধ্যে যে আলোচনা চলিতেছিল তাহা রজতের মা মিনতি দেবী বেশ মন দিয়া শুনিতেছিলেন। এইবার তিনি ধীরে মৃদুস্বরে বলিলেন: দেখ রজত, আমি তোমার এ নিমন্ত্রণ বেশ ভাল মনে করি। পৃথিবীতে শত্রু করা সহজ, বন্ধু করা বড় কঠিন। বাবার সঙ্গে আজ কত বৎসর দেখা নেই! আমি যে স্নেহ থেকে বঞ্চিত হয়েছি, সে স্নেহ যদি তোমরা তাঁর কাছ থেকে আদায় করে নিতে পার তবে আমি যে কত সুখী হব বাবলু, সে তোমাকে কেমন করে বোঝাব বল? তারপর ভয় কেন করবে? পুরুষ হয়ে জন্মেছ, কতদিকে কত বাধা বিপদ আসবে, সব পার হয়ে যেতে হবে। তারপর নানা দেশ বেড়ালে জ্ঞান ও বুদ্ধি বাড়ে নানা বিষয়ে অভিজ্ঞতা জন্মে।

রজত কিন্তু মায়ের কথার দিকে মন না দিয়া সে ভাবিতেছিল একি বিপদ! যদি তার সারা ছুটিটা বোম্বে কাটিত তাহা হইলেও সে

এত দুঃখিত হইত না, কিন্তু একটা ছিঁচকাঁদুনে মেয়ের কাছে দিন কাটানো—না-না ভাবতেও যে মন কেমন করে! —কিন্তু আবার সেই গাড়ীর বুড়োর সতর্কবাণী স্মরণ করিয়া তাহার মনে জাগিতেছিল অদম্য উৎসাহ—দেখা যাক না কি বিপদ তার অদৃষ্টে ঘটে। বাড়ীর নাম যাদুপুরী—দেখবে সে কি এমন আছে তাকে সেখানে যাদু করে ফেলবে? নাম শুনে সে ভয় পায় এমন ছেলেত সে নয়।—এইরূপ নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে শেষবার সে স্থির করিল—নিশ্চয়ই সে যাবে—হক্‌না সে দেশ, ব্রহ্ম, চীন বা হণ্‌লুলু!

রজতকে কোন কথা বলিতে না শুনিয়া মিনতি দেবী তেমনি মৃদুস্বরে বলিলেন:—তুমি কি যেতে চাও না বাবলু? রজত গম্ভীর ভাবে বলিল:—যেতে খুবই ইচ্ছা হয় মা, কোন দিনত আর ব্রহ্মদেশ দেখিনি, তবে—

মিনতি দেবী বলিলেন:—উঃ বুঝেছি, গাড়ীর সেই বুড়োর কথা! ওকথা ভেবে তুমি মন খারাপ করো না। জ্যোতিষীরাত কতজনের হাত দেখে কত কথাই না বলেন। কি আছে তার মূল্য? তুমি তেমনি নির্ভীক মনে—চলে যাও। তোমার দাদুভাই কি পারেন তোমাকে কোন বিপদে ফেলতে? আর বার্মা সে হচ্ছে প্রকৃতির লীলা-নিকেতন! রজত হাসিয়া কহিল: মা—তুমি আমায় ভুল বুঝোনা, আমি ঠিক করেছি, যদি বাবা আর তুমি যেতে বলো, আমি নিশ্চয় যাব ভয় আমি করিনে, তবে কি জান ঐ তোমার মীরা। উঃ—ছিঁচকাঁদুনী মেয়েটার সঙ্গে কেমন করে থাকবো বলত! ভাবলেও আমার মন দমে যায়। তারপর একথাও ভাবি কত বৎসর হ'য়ে গেল, দাদুভাইত একদিনের জন্যও আমাদের কথা ভাবেন নি, নয় কি? আমাদের খোঁজ খবর পর্য্যন্ত তিনি করেন নি......এখন এতদিন পরে কি ভেবে তিনি আমাকে ডেকে পাঠালেন বুঝতে পারলুম না।

মিনতি দেবী হাসিয়া রজতের চিঠিখানি রজতের হাতে ফিরাইয়া দিলেন এবং বলিলেন: তোমার বাবা বাড়ী ফিরে এলে তাঁকে চিঠি দেখাব এবং সব কথা বলবো, পরে তিনি যা ভাল মনে করেন তাই হবে!

সন্ধ্যার পর ডক্টর সেন বাড়ীতে যখন বারান্দার আরাম- কেদারা-খানায় বসিয়াছিলেন—আকাশে তখন চাঁদ আলো ছড়াইয়া দিতেছিল! হাস্নুহানার উগ্র সুরভি চারিদিক সুরভিত করিতেছিল। এমন সময় বাড়ীর সবাই এক সঙ্গে এসে তাঁকে ঘিরিয়া বসিল। এ সময়টিতে ডক্টর সেন পরিজনের সঙ্গে পরম স্নেহ ভরে আলাপ ও নানা বিষয়ে গল্প করিতে ভালবাসিতেন। আর তাঁর গল্প বলবার শক্তিও ছিল বেশ, ধীরে ধীরে দেশ বিদেশের কথা, সহরের কথা, যে-সব কথা বাড়ীর সকলের জানা উচিত সে সমুদয় বিষয় লইয়া আলাপ করিতেন। রুণু হয়ত গান গাহিত। মিনতি দেবীও সংসারের সব কাজ সারিয়া এই শুভ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেন। আজ এই যে দাদুভাইয়ের চিঠি বার্মা হইতে আসিয়াছে, এই চিঠির সংবাদ বাবাকে বলিবার জন্য ছেলে মেয়েরা তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিল এবং কে আগে এইরূপ একটা নূতন সংবাদ বাবাকে বলিবে সেজন্য উতলা হইয়া উঠিয়াছিল, ফলে সকলেই একসঙ্গে কলরোল করিয়া উঠিল।

ডক্টর সেন হাসিতে হাসিতে বলিলেন:—ওরে তোরা যে ভীমরুলের মত আমাকে ঘিরে ফেল্লি! তোরা একজনে বল্। রজত সব কথা গুছাইয়া বলিয়া পরে বাবার কাছে তার দাদুভাইয়ের চিঠিখানি দিল। তিনি পাইপ টানিতে টানিতে গম্ভীর ভাবে চিঠিখানি পড়িয়া আবার রজতের হাতে ফিরাইয়া দিলেন, এবং কিছুক্ষণ পরে রজতের দিকে চাহিয়া কহিলেন:—তাহলে তুমি বার্মা যেতে চাইছ? কেমন! রজতের উৎসাহদীপ্ত মুখখানির দিকে চাহিয়া তিনি একথা কয়টি বলিলেন।

রজত কহিল: হাঁ বাবা! যদি টাকাটা এসে যায়। ডক্টর সেন বলিলেন: তোমার দাদু যখন লিখেছেন, তখন টাকার ভাবনা তোমার ভাবতে হবে না। এই একটি মানুষ যে জীবনে কোনদিন কথার নড়চড় করেন না।

রজতের মন এখন বার্মা যাইবার জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। যত তাড়াতাড়ি বিপদের মাঝখানে গিয়া ঝাঁপিয়ে পড়া যায় ততই যে ভালো।

ডক্টর সেন তাঁহার স্ত্রীর দিকে চাহিয়া বলিলেন: তোমার বাবা, কিন্তু তোমাকে স্মরণ করেন নি, করেছেন তাঁর নাতিকে—বুঝলে

মিনতি,—আসলের চেয়ে সুদের মায়া বেশী। তারপর রজতকে বলিলেন:—ইচ্ছে করে বাহাদুরী দেখাবার লোভে যেন কোন বিপদের মুখে ঝাঁপিয়ে পড়ো না। মাথা ঠান্ডা করে চলো। —সাহস তাকেই বলে যার ভিতর থাকে মহত্ব ও নির্ভীকতা—একগুয়েমি করে কোন কাজ করো না যেন। তুমি বুদ্ধিমান্—সাবধানে দেখে শুনে চলো বাবা। বেশ ধীর ও গম্ভীরভাবে ডক্টর সেন একথা কয়টি বলিলেন।

রজতের মন ডক্টর সেনের কথায় প্রফুল্ল হইল। তার বাবা যে তাকে কোনও দুঃসাহসিক অভিযান বা বিপদের মুখে যেতে বাধা দিলেন না, সেজন্য আজ তাহার মনে হইতেছিল, সত্য সত্যই বাবা তাহার বড় ভাল মানুষ সত্যই তিনি রজতকে ভালবাসেন।

পিতার এইরূপ স্নেহপূর্ণ ব্যবহারে মেয়েদের মনও সন্তোষে ভরিয়া গেল। রজতের মনে তখন ভাসিতেছিল সমুদ্র-যাত্রার আনন্দপূর্ণ স্বপ্নের ছবি।

দুইদিন কাটিয়া গেল রজতের যাত্রার ব্যবস্থা করিতে। ব্যাঙ্কের লোক আসিয়া নির্দিষ্ট সময়ে টাকা দিয়া গিয়াছিল। রজত তাহার দাদুভাইয়ের নামে যাত্রার আয়োজন ঠিক্ করিয়া রওয়ানা হইবে সেকথা জানাইয়া তার করিয়া দিল।

এক শুভদিনে সে বাবা ও মা ও ভাই বোনদের কাছ হইতে বিদায় লইয়া জাহাজে চড়িল। জাহাজখানি সিলোন বা লংকা দ্বীপ হইয়া ভারতের পূর্ব্ব উপকূলের পথ ধরিয়া ব্রহ্মদেশে পৌছিবে। সে এই দীর্ঘ পথটিই ইচ্ছা করিয়া বাছিয়া লইয়াছিল। কতদেশ সে দেখিবে, কত অজানাকে সে পাইবে বন্ধুরূপে—তাহার মন আনন্দে ভরিয়া গিয়াছিল।

যেদিন সে জাহাজে উঠিবে—সেদিন ডক্টর সেন, মিনতি দেবী ও বোনেরা আসিয়া তাহাকে জাহাজে তুলিয়া দিল। মা বলিলেন: সাবধানে থেকো। বাবা বলিলেন: কিছু ভয় করোনা—ভেবে চিন্তে কাজ করবে।—বোনেরা বলিল:—সব খবর জানিয়ে বড় বড় চিঠি লিখো। তারপর জাহাজ সমুদ্রের বুকে ধীরে ধীরে ভাসিয়া চলিল। ডক্টর সেন ও মিনতি দেবী নীরবে তীরে দাঁড়াইয়া রহিলেন। রুণু, ঝুণু, টুণু তাহাদের রুমাল নাড়িতে লাগিল। রজত জাহাজের রেলিং এর পাশে দাঁড়াইয়া তীরের দিকে অপলকে চাহিয়াছিল।

ক্রমে জাহাজ সকলের অদৃশ্য হইয়া গেল। সমুদ্রের দিকে সবুজ জল আলোড়ন করিয়া জাহাজ দেখিতে দেখিতে বোম্বাই বন্দর ছাড়াইয়া অদৃশ্য হইল।

রজত তখন ভাবিতেছিল—সেত জানে না কোন্ অজানা দেশের দিকে তাহার যাত্রা সুরু হইল। অজানাকে না জানা পর্য্যন্ত মানুষের মনে আসে নানা কল্পনা ও ভয় কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে যখন তাহার সাক্ষাৎ মিলে তখন কোন আশংকা আর থাকে না।

সে দেখিতে লাগিল, সমুদ্রের তরঙ্গ, অপরাহ্নের রৌদ্রদীপ্তিতে জ্বলিতে জ্বলিতে কোন দূর সমুদ্রের বুক হইতে অতি বেগে তীরভূমির সন্ধানে নাচিতে নাচিতে ছুটিয়াছে।

—পাঁচ—

নূতন বন্ধু

রজত আজ ষ্টীমারের ভিতর আপনাকে সম্পূর্ণ একা অনুভব করিল। মনে পড়িল বাবা-মার কথা—আর বোন্‌দের কথা। জাহাজ সমুদ্রের নীলজলের বুকে আলোড়ন জাগাইয়া চলিতে লাগিল। ক্রমে বোম্বে নগরের বাড়ী-ঘরগুলি অদৃশ্য হইয়া গেল, শ্যামল তটভূমি মিলাইয়া গেল অপরাহ্নের সূর্য্যের কনকদীপ্তির শেষ রশ্মির রক্তিমাভার সঙ্গে সঙ্গে। রজত একাকী ডেকে দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল—উৰ্দ্ধে অনন্ত নীল আকাশ, আর নিম্নে শুধু নীলজল—অসীম সমুদ্র—কোথায় তার শেষ! জাহাজ ক্রমশঃ গভীর সমুদ্রের দিকে চলিল। মাথার উপর দিয়া সামুদ্রিক পাখীরা সব উড়িতে লাগিল। রজত মুগ্ধচিত্তে সে সব দেখিতে লাগিল। এতদিন তাহার মনে নূতনের প্রতি যে আগ্রহ ছিল যে উৎসাহ ছিল, আজ সহসা যেন সে-সাহস ও উৎসাহ কোথায় মিলাইয়া গেল। আজ সে মনে করিল আপনাকে সম্পূর্ণ একা।

জাহাজের বিজলিবাতি সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গেই জ্বলিয়া উঠিল। রজত দেখিতে লাগিল জাহাজে কত দেশের কত লোক চলিয়াছে—নানা দেশে—কেহ চলিয়াছে ব্যবসায় করিতে, কেহ চলিয়াছে চাকুরীর সন্ধানে। পাঞ্জাবী, মারাঠি, তেলেঙ্গি, গুজরাটি, ইংরাজ সব দেশের লোকই আছে—কিন্তু একা সে বাঙ্গালী।

মানুষের স্বভাবই এই যে সে নিজ জাতির লোকের সন্ধান করে। বিদেশে বাঙ্গালী বাঙ্গালীর হয় পরম বন্ধু। এ-ষ্টীমারে একটি বাঙ্গালীকেও সে দেখিতে পাইল না—দেখার সম্ভাবনাও নাই। সে আপনার কেবিনে চুপ করিয়া শুইয়া পড়িল। কয়েকদিন পরে জাহাজের দু' চার জন লোকের সঙ্গে আলাপ জমিয়া উঠিল। একজন গুজরাটি বণিক থিয়াটুর কাছাকাছি একটা ছোট গ্রামে যাইবে—

সেখানে সে সপরিবারে বাস করে, সঙ্গে তাঁর স্ত্রী ও একটি ছেলে রজতের প্রায় সমবয়সী। দ্ব'জনের কয়েকদিনের মধ্যেই ভাব হইল। ছেলেটি ইংরাজী স্কুলে পড়ে, কাজেই প্রথম কয়েকটা দিন যেমন সে আপনাকে একান্ত নিঃসঙ্গ বোধ করিতেছিল—এখন আর তাহা রহিল না। দ্ব'জনে গল্প করিয়া, ছ্বটাছ্বটি করিয়া কাটাইয়া দিত। গ্বজরাটি ছেলেটি তার বাবা-মার গল্প করিত, রজতও তার বাবা, মা ও ভাইবোনদের কথা বলিত, এইভাবে দ্ব'জনের মধ্যে বেশ ভালবাসা জন্মিয়াছিল। অজানা পথে কত বন্ধ্ব মিলে আবার কতজনকে হারাইতে হয়। গ্বজরাটি ছেলের বাবা, মাও খ্বব ভাল লোক। তাঁহারা দ্বইজনে ইংরাজী ও হিন্দী ভাষায় কথা বলিতে পারেন, ছেলেটির মা রজতকে আপনার ছেলেরই মত আদর করিতেন, কেবিনে ফল ও মিষ্টি পাঠাইয়া দিতেন। রজত থিয়াট্বর অনেক গল্প তাঁহাদের কাছে শ্বনিতে পাইল এবং সে জানিতে পারিল যে তাহার দাদ্বভাইয়ের নাম তাঁহারা শ্বনিয়াছে বটে, কিন্তু মান্বষটিকে তাঁহারা কোনদিন দেখেন নাই।

একদিন জাহাজ আসিয়া কলম্বো সহরে ভিড়িল। কলম্বো লঙ্কার রাজধানী। এক সময়ে অন্বরাধাপ্বর ছিল সিংহলের রাজধানী। অনেক বৌদ্ধযাত্রী কলম্বো নামিয়া গেল—সিংহলের বৌদ্ধতীর্থ সব দেখিতে। কলম্বো সহরের দৃশ্য তাহাকে ম্বগ্ধ করিল। নারিকেল-কুঞ্জবেষ্টিত স্বন্দর সহরটি। লঙ্কার লোকদের সে দেখিল কৌতূহলি চক্ষে।

এইভাবে নানা দেশ ঘ্বরিয়া একদিন বেলা ১১টার সময় তাহাদের জাহাজখানি আসিয়া রেঙ্গ্বনে জেটিতে নঙ্গর করিল। রজত তাহার ছোট স্বটকেশ, বিছানাপত্র গ্বছাইয়া লইয়া নামিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। বাড়ীর জন্য, বাবা—মা ও বোনদের জন্য তাহার মনের মধ্যে যে বেদনা তাহাকে পীড়া দিতেছিল আজ এই ন্তন আবেষ্টনীর ভিতর আসিয়া তাহা আর ছিল না।

যাত্রীরা একে একে নামিতে লাগিল। কত রঙবেরঙের পোষাক পরা মেয়েরা ও প্বর্বষেরা সব পথ দিয়া চলাফেরা করিতেছে। রিকশা, মোটরগাড়ী, ট্রাম সব ছ্বটিয়া চলিয়াছে। এ যেন এক বিচিত্র

বরণ ও বিচিত্র বেশের দেশ—এ যেন সেই-পী (Shwe Pyi) বা সোণার দেশ।

রজত নীচে নামিয়া আসিয়া এদিক ওদিক দেখিবার জন্য লক্ষ্য করিতেছিল। কেহ তাহাকে লইতে আসিয়াছে কিনা তাহাই দেখিল। গুজরাটি বণিক, তাঁহার স্ত্রী ও ছেলেটি বলিল—তাহাদের রেঙ্গুনে এক সপ্তাহ দেরী হইবে, যদি কোন অসুবিধা না হয় তাহা হইলে রজত এ কয়দিন তাহাদের বাড়ী থাকিতে পারে।

রজত তাহাদিগকে ধন্যবাদ দিয়া বলিল—নাঃ সে সম্ভব নয়, এখানে নিশ্চয়ই তাহাকে কেহ লইতে আসিবে। বণিকেরা চলিয়া গেলেন।

রজত একটা ট্যাক্সি ভাড়া করিয়া তাহার মধ্যে সুটকেশটি তুলিয়া



আমাদের বাড়ীর গাড়ী উঠুন

দিয়াছে, বিছানার বান্ডেলটি লইয়া সে ট্যাক্সিতে বসিতে যাইবে ঠিক এমন সময় সাহেবি পোষাক পরা একজন বর্মি যুবক তাহার মুখ হইতে লম্বা চুরুটটি নামাইয়া রজতের ট্যাক্সির দরজার হাতল ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল—আপনি কি মিঃ রজত সেন? বোম্বে থেকে এলেন?

রজত বলিল হাঁ!

তখন সেই বর্মি যুবকটি কহিল—আমি আপনাকে নিতে এসেছি। ভেবেছিলাম আপনি হবেন আমারই বয়েসী—তাত নয় এযে একেবারে ছেলেমানুষ। একথা বলিয়া হাসিয়া বলিল—তাইত আপনাকে ঠিক সময়ে চিনে ফেলেছি। নইলে কি মুস্কিলই হ'ত। ট্যাক্সির দরকার নেই—ছেড়ে দিন। আমাদের বাড়ীর গাড়ী সঙ্গে আছে।

এইবার সেই বর্মি যুবকটি ট্যাক্সিওলাকে তাহার ভাড়ার বাবদ দুইটি টাকা দিয়া নিজেই রজতের সুটকেশটি এবং বিছানার বান্ডেলটি বাহির করিয়া লইয়া একটা কুলির মাথায় তুলিয়া দিয়া কিছু দূরে ষ্ট্র্যান্ডের উপর যে একটা বাদামি রংএর বড় মোটর গাড়ী অপেক্ষা করিতেছিল সেখানে গিয়া উঠিয়া বসিল। দুইজনে বেশ আরামের সঙ্গে গাড়ীর ভিতর বসিলে পর বর্মি যুবকটি বলিল—মাষ্টার সেন, আপনার বড় অসুবিধা হয়েছে নয়? আমি আপনাকে আমার কাছ দিয়ে যেতে দেখলাম, তবু ভাবিনি যে আপনিই—

রজত হাসিয়া কহিল আপনি ভাবেননিযে আমি এত ছোট্ট মানুষটি।

যুবকটি হাসিতে লাগিল এবং চুরুট ধরাইয়া কহিল—থিয়াটুর গাড়ী রাত্রি বারোটায় ছাড়বে। সে অনেক দেরী। চলুন আমাদের ফার্মের যে বাড়ীটি আছে সেখানে। বেশ আরাম করে খাওয়া দাওয়ার পরে একটু বিশ্রাম করে নেবেন, তারপর আপনাকে রেঙ্গুন সহরটা ঘুরে দেখিয়ে আনবো।

রজত আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল—কহিলঃ সে বেশ হবে! আচ্ছা, থিয়াটুতে কি দাদামশায়ের সঙ্গে আমার দেখা হবে না? যুবক গম্ভীর ভাবে কহিল—আপনার আসবার ও থাকবার সব ব্যবস্থা করে দিয়ে তিনি আজ পাঁচদিন হলো মিশর দেশে চলে গেছেন। উঃ

সেজন্য আপনার কোন ভাবনা নেই—আপনার কোন অসুবিধা হবে না।

আপনিও কি সে বাড়ীতে থাকেন?

যুবক মাথা নাড়িয়া কহিল—না। তবে কাছাকাছিই আমার বাড়ী। কোন আশংকা নেই আপনার বেশ আনন্দেই দিন কাটাতে পারবেন। বড় সুন্দর জায়গা থিয়াটু, সমুদ্র ও পাহাড়ের অপূর্ব্ব সমাবেশ, প্রকৃতি সেখানে দু'হাতে সৌন্দর্য্য ছড়িয়ে রেখেছেন। আমার দেশ বলে যে কিছু বাড়িয়ে বলছি তা নয়—দেখলেই বুঝতে পারবেন।

রজতের মন সে কথার দিকে ছিল না পরম কৌতূহলের সহিত পথের দুইদিকের বিচিত্র শোভা সে দেখিতেছিল। এমন সময় গাড়ী একটি সুন্দর বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

— ছয় —

সোয়েডাগোন প্যাগোডা

নূতনের একটা আকর্ষণ আছে। রজত রেঙ্গুন সহরে আসিয়া নূতন রকমের লোকজন, নূতনতর বেশভূষা ও নানা দেশের নানা পোষাকপরা পথিকদের পথ দিয়া চলিতে দেখিয়া আশ্চর্য্য বোধ করিল। তাহাদের এই বাড়ীর বসিবার ঘর ত দেখা যাইতেছিল রেঙ্গুনের বিখ্যাত শোয়েডাগোন বা বড় ফয়া। উজ্জ্বল সূর্য্যালোকে তাহার কনককিরীট ঝলমল করিতেছিল। রজত উৎসুক হইয়াছিল, সেই প্যাগোডাটি দেখিবার জন্য। তাড়াতাড়ি স্নান আহার শেষ করিয়াই সে মা-হেনকে বলিল, চলুননা, আমরা বেরিয়ে পড়ি। মিঃ মা-হেন বলিলেন বেশত!

পিচ্‌ঢালা সুন্দর পথ দিয়া মোটর ছুটিয়া চলিল। পথটা বেশ প্রশস্ত। রেঙ্গুন সহরটি পরিস্কার পরিছন্ন। গলি ঘুঁজি একেবারেই নাই। একদিকে ষ্ট্রান্ড রোড, অন্য দিকে ষ্টেশন রোড বা মন্টগোমারী ষ্ট্রীট এই হইতেছে সহরের সীমানা। এই দুই পথের মাঝ দিয়া ফ্রেজার ষ্ট্রীট, ডালহৌসী ষ্ট্রীট, মার্চেন্ট ষ্ট্রীট, নামে কয়েকটি সমান্তরাল রাস্তা আবার চলিয়া গিয়াছে। রেঙ্গুনে অনেক বাজার আছে। অন্যান্য বাজার ছাড়া কর্পোরেশনেরও বাজার আছে। বগুলা বাজার নামক বাজারটিতে বাঙ্গালীদের আহার্য্য সব মিলে। রজত কৌতূহলপূর্ণ নেত্রে রাস্তা, বাজার সব দেখিতে দেখিতে চলিল।

তাহারা দুইজনে অবশেষে বড় ফায়ার নীচে আসিয়া পৌছিল। এসিয়ার বিস্ময়ের বস্তু এই শোয়েডাগন প্যাগোডা। একটা ছোট পাহাড়ের মত উচু জায়গায় প্যাগোডাটি অবস্থিত। অনেকগুলি প্রশস্ত ধাপ পার হইয়া উপরে উঠিলে পর এক সমতল যায়গায় পৌছা যায়। প্যাগোডার উপরে উঠিবার সিঁড়ি বরাবরই ছাদযুক্ত। রজত

আনন্দে লাফাইয়া লাফাইয়া সিঁড়ির পর সিঁড়ি পার হইতে লাগিল, কি তাহার উৎসাহ কি তার উদ্দীপনা। সিঁড়ির সংখ্যাও নেহাত কম নয়। রজত দেখিল সিঁড়ির দুইপাশে ফুলের দোকান, ফুলের সৌরভে চারিদিক সুরভিত—চারিদিকে একটা আনন্দের ও সৌন্দর্য্যের আবহাওয়া সৃষ্টি করিয়াছে।

রজত কহিল: মিঃ মাহেন, আশ্চর্য্য আপনাদের দেশের এইসব ফুলওয়ালী মেয়েরা, কি সুন্দর তাদের মুখের হাসি, এখানে বাঙ্গলার মেয়েদের সঙ্গে অনেক তফাৎ।

মা-হেন কহিলেন—আপনারা জীবনকে যেমন একটা গুরু গম্ভীর ভাবে দেখে থাকেন, আমাদের দেশের পুরুষ ও মেয়েরা তেমনভাবে দেখতে জানে না। তারা চায় আনন্দ!

বর্মাদেশের নানা সুন্দর সুন্দর সৌখীন শিল্পদ্রব্যও সেখানে বেচাকেনা চলিতেছে। যারা বেচাকেনা করে তাদের মধ্যে বেশীর ভাগই বর্মী মেয়ে, অনেক দোকানে পুরুষ ও মেয়ে উভয়েই রহিয়াছে। মা-হেন:—এই যে সব দোকানী দেখ্‌তে পাচ্ছেন, মিঃ সেন, এদের অনেকের বাড়ীই এখানে। রজত বিস্ময়ের সহিত দেখিল, কেউ বা নাপ্পি মিশাইয়া বর্মী চেলী সিদ্ধ খাইতেছে, কেহ চুরুট টানিতেছে কিন্তু যে যাহাই করুক না কেন খদ্দের কেহই হাতছাড়া করিতেছে না। সকলকেই মিষ্টি হাসিয়া অভ্যর্থনা করিতেছে।

রঙ্গীন রেশমের লুঙ্গী পরা, গায়ে শাদা গেঞ্জি আঁটা, মুখে তানাখা মাখা, মাথার বিচিত্র কবরীতে ফুল বা চিরুণী দেওয়া বর্মী মেয়েরা ফুল বেচিতেছে।

রজতও মাহেন একজন ফুলওয়ালীর কাছ হইতে কিছু ফুল, মোমবাতি, ধূপকাঠি কিনিয়া সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিতে লাগিল। মা-হেন রজতকে অতি সুন্দর ভাবে সেই উচ্চ স্থান হইতে নীল আকাশ যেখানে ধনুকের মত বাঁকিয়া গিয়াছে তাহার সীমায় সীমায় শ্যামল শ্রী মন্ডিত পল্লীর রূপ, ক্ষেত্রের সবুজ শোভা ও অনেক নূতন স্থানের সহিত পরিচয় করাইয়া দিতেছিল।

দুই প্রধান প্যাগোডার চারিপাশে অনেক কাঠের মন্দির এবং সুবিস্তৃত মর্ম্মর প্রস্তর নির্ম্মিত অঙ্গনের স্থানে স্থানে বিভিন্ন মন্দির

আছে। সে সব মন্দিরে বুদ্ধদেবের একটি প্রকান্ড মূর্ত্তি স্থাপিত। মূর্ত্তির পাশে পাশে আনন্দ প্রভৃতি তাঁর শিষ্যদের কাহারও কাহারও ছোট ছোট মূর্ত্তি। উপরে একটি চীনদেশীয় মন্দির আছে। তার ভিতরের সাজ-সজ্জা অপর মন্দির অপেক্ষা ভিন্ন রকমের। প্যাগোডার মধ্যে একটি খুব বড় ঘন্টা আছে। রজত মহা আনন্দে হাতুড়ি দিয়া ঘন্টা পিটিতে লাগিল। ঢং ঢং ঢং ঢং সেই ঘন্টাধ্বনি চারিদিকে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। রজত হাসিতে লাগিল।



সোয়েডাগোন প্যাগোডা

মা-হেন হাসিয়া কহিল—কি করলেন! মিঃ সেন, জানেন এ ঘন্টা পিটালে তাকে আবার এদেশে আসতে হয়, জানেন তা?

রজত বলিল জানিনাত!

বেশ তাহলে আবার আপনার এদেশে আসতে হবে। হঠাৎ মা-হেনের একজন বন্ধু তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল:—দিগো—বে তোয়া মেলে—এদিকে কোথায় যাচ্ছ?

মা-হেন হাসিয়া বলিল—পাত্যেই ফোয়ে—কিনা মঠের মধ্যে। মা-হেনের বন্ধু চলিয়া গেল।

রজত মুগ্ধভাবে সেকথা শুনিল। কত বর্মী নর-নারী ফুলের মালা ও পুষ্পগুচ্ছ হাতে লইয়া ফায়ার কাছে নিমীলিত নয়নে প্রার্থনা করিতেছেন। কোথাও ফুঙ্গীরা উপদেশ দিতেছেন। ভক্তির সহিত বর্মী পুরুষ ও মহিলারা সেই উপদেশ শুনিতেছেন। চারিদিকে একটা সৌম্য শান্ত ভাব—মধুর সৌরভে সুরভিত সেখানকার আকাশ ও বাতাস, পুষ্প পরিমলে চারিদিকে প্রমোদিত করিয়া আপনা হইতেই শ্রদ্ধায় ও ভক্তিতে মনকে মুগ্ধ করে।

রজত ভক্তিভরা চিত্তে তথায় ভিতরকার বুদ্ধদেবের পদ্মাসনে উপবিষ্ট সৌম্য গম্ভীর শান্তমূর্ত্তি দেখিয়া প্রণাম করিল। ধূপ জ্বালিল ও মোমবাতি জ্বালিল, মা-হেনও তাহাই করিলেন। শায়িত শ্বেত প্রস্তরের প্রকান্ড মূর্ত্তি দেখিয়া রজত মাথা নত করিল। প্যাগোডার সংলগ্ন যাদুঘরটি ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিয়া আশ্চর্য্য হইল। নানা দেশের নানা সম্প্রদায়ের লোকেরা ভক্তিভরে এই বুদ্ধ মূর্ত্তিকে কত বিভিন্ন জিনিষ উপহার দিতেছেন। রজত লক্ষ্য করিল প্যাগোডার চারিদিকে চারিটি সিংহদ্বার। এই সব প্রবেশ পথের দ্বারগুলির মধ্যে দক্ষিণ দিকের তোরণটি অধিকতর সুন্দর এবং নানা কারুকার্য্য বিভূষিত।

এই বড় ফয়া বা সোয়েডাগন প্যাগোডা খাঁটি ব্রহ্মদেশের কীর্ত্তি। এখানে বর্ম-মহিলারাই পূজা দিতে আসেন—বাঙ্গালী বৌদ্ধ যাঁরা তারাও আসেন। সকলের চেয়ে আশ্চর্য্য এই যে হিন্দু মন্দিরের ন্যায় ইহার মধ্যে প্রবেশ করিতে কোন জাতি বিচার নাই, সর্ব্বধর্ম্মের সর্ব্বজাতির জন্য প্যাগোডাগুলির দ্বার মুক্ত।

যাত্রীরা সকলেই নগ্নপদে চলিতেছে তাহারাও নগ্নপদে চলিল,—

তবে অন্যান্যদের মত জুতো খুলিয়া হাতে করিয়া নিল। ইহাতে কোন দোষ নাই।

রজত, তাহার বন্ধু মিঃ মা-হেনকে নীচে নামিবার সময় হর্ষবিভোর চিত্তে কহিল:—জানেন মা-হেন, বুদ্ধদেব আমাদের ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, ভারত তাঁকে ভুলিল, আপনারা কিন্তু সেই মহাপুরুষকে আপনাদের দেশে রেখেছেন নানা দিক দিয়ে অমর করে।

মা-হেন [illegible] ভাবে কহিলেন:—[illegible] যত মহাপ[illegible] [illegible] নিজেদের জন্মভূমিতে কখনো সমাদর পান না।

তখন বেলা পড়িয়া আসিয়াছিল। অপরাহ্ন সূর্য্যের রক্তিম রশ্মি দিকে দিকে আসন্ন সন্ধ্যার আগমনী সূচনা করিতেছিল। রজতকে লইয়া মা-হেন চলিলেন রেঙ্গুনের রয়েল লেক দেখাইতে। গাড়ী ছুটিয়া চলিল। সেখানে পৌঁছিয়া রয়েল লেকের তালিকুঞ্জ শোভিত রাস্তাটি তাহার কাছে বড়ই ভাল লাগিল। হ্রদটির চারিদিকে বড় বড় সব গাছ। এজন্য হ্রদের চারিদিকের সৌন্দর্য্যকে স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়। এই পথে রজত অনেক বাঙ্গালী মহিলাকে বেড়াইতে দেখিল। লেকের অল্পদূরে যে বস্তীটি রহিয়াছে তাহার নাম কালা বস্তী। এ নাম দিয়াছে বর্মীরা। এই কালা নামটি যে শুধু বাঙ্গালীকেই তাহারা দিয়াছে তাহা নহে, শ্বেতাঙ্গ ইউরোপীয়দের দিতেও কুন্ঠিত হন নাই।

সহসা হ্রদের বুকে আলোকের উজ্জ্বল আনন্দ চঞ্চল নৃত্য আরম্ভ হইল। শোয়েডাগন প্যাগোডার সব আলোকগুলি তখন জ্বলিয়া উঠায় স্থির শান্ত রয়েল লেকের সুনীল স্বচ্ছ নীরে ছোট ছোট ঢেউগুলির বুকে বুকে আলো নাচিয়া ছুটিয়া বেড়াইতেছিল।

বাড়ী ফিরিবার পথে মা-হেন মোগল ষ্ট্রীটের মোড় হইতে আরম্ভ করিয়া ফ্রেজার ষ্ট্রীটের পায়ে চলা পথের উপর নানা রকমের মনোহারী যেসব দোকান বসিয়াছে তাহা দেখাইয়া নিল। এইসব দোকানের মালিক বেশীর ভাগই চট্টগ্রাম ও মান্দ্রাজী মুসলমান!

মা-হেন রজতকে বাঙ্গালীদের প্রতিষ্ঠান দুর্গাবাড়ী, রামকৃষ্ণ মিশন প্রভৃতি দেখাইয়া যখন বাড়ী ফিরিল—তখন রাত্রি নয়টা বাজিয়াছে।

সে একটু বিশ্রাম করিয়া তাহার বাবা, মাও বোন্‌দের কাছে পথের ও বেঙ্গুনের সেদিনকার দেখা সব কথা লিখিয়া পাঠাইল।

মা-হেন বলিলেন—আমাদের গাড়ী রিজার্ভ আছে। চলুন বাড়ী থেকে খাওয়া দাওয়া সেরে গাড়ীতে গিয়ে শুয়ে থাকি। মিছামিছি এখানে পড়ে থেকে লাভ কি? রজতের কাছেও এ প্রস্তাবটি বেশ সঙ্গত বলিয়া মনে হইল। তাহারা ষ্টেশনে আসিয়া গাড়ীতে নিশ্চিন্ত আরামে শুইয়া পড়িল। কখন গাড়ী ছাড়িল—সে তাহা জানিতেও পারিল না।

পরদিন প্রত্যুষে রজতের ঘুম ভাঙ্গিলে সে দেখিতে পাইল—ট্রেণখানি বেগে ছুটিয়া চলিয়াছে। দুই পার্শ্বে ইরাবতী নদীর সমতল ভূমির উপর শস্যশ্যামল প্রান্তর দূরে নীল আকাশের গায়ে গিয়া মিশিয়াছে। ধানগাছের শ্যামল সবুজ শ্রীর বুকে ঢেউ তুলিয়া বাতাস বহিয়া চলিয়াছে।

—সাত—

একি ভুতুড়ে বাড়ী ?

থিয়াটুতে যখন গাড়ী আসিয়া পৌছিল তখনও ভাল করিয়া প্রভাতের আলো চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে নাই। সূর্য্যের মৃদু অথচ উজ্জ্বল কিরণে একটা আনন্দ ও উৎসাহের ধারা প্রবাহিত হইতেছিল।

ষ্টেসনটি বড় সুন্দর। পাহাড়ের ঢালু জমিতে অবস্থিত। তারপরেই সবুজ, ধূসর ও নীল পর্ব্বত শ্রেণী ঢেউয়ের মত একটির পর একটি সার বাধিয়া চলিয়াছে। ফুলে ফুলে আচ্ছন্ন সবুজ পাতায় ঢাকা বড় বড় তরুর ছায়ার ষ্টেসনটিকে দেখাইতেছিল একটি বাগানের মত। কত পাখীই না ডাকিতেছিল। রজতের কাছে এই ছোট ষ্টেসনটি, এখানকার প্রাকৃতিক শোভা এবং লোক জনের চলা ফেরা খুবই ভাল লাগিতেছিল।

মাহেন ও রজত দু'জনে গাড়ী হইতে নামিল। বর্মী কুলি-রমণীরা জিনিষপত্র নামাইতে একজন দীর্ঘাকৃতি বর্মী যুবক আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার গায়ের রঙটা তামাটে ধরণের। মাথার চুলগুলি পিছন দিকে ফিরানো। হাতে একটা লাঠি। মুখে একটা লম্বা চুরুট। সে মা-হেন ও রজতকে নমস্কার করিয়া মা-হেন কে জিজ্ঞাসা করিল:—পথে কোন কষ্ট হয়নিত? মা-হেন হাসিয়া বলিল—না। তারপর রজতকে দেখাইয়া কহিল:—এই তোমার মনিব মিঃ সেন?

লোকটি এইবার ভাল করিয়া রজতের দিকে চাহিল।

রজত মাহেনকে জিজ্ঞাসা করিল এখান থেকে কতদূর হবে দাদুর বাড়ী?

এক মাইল হতে পারে।

তিনজনে মালপত্র লইয়া বাহিরে আসিল। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন

পাহাড়ের পথ। আঁকিয়া বাঁকিয়া পাহাড়ের মধ্যদিয়া চলিয়াছে। একখানা ছোট ঠেলা গাড়ীতে একজন লোক তাহাদের মালগুলি ঠেলিয়া লইয়া আসিতেছিল। পথ চলিয়াছে সর্পিল গতিতে।

থিয়াটু একটি ছোট সহর—যেন একটি পল্লী। আকাশস্পর্শী নানা গাছ—পথের ধারে ধারে বনের ফুল। অজস্র বন গোলাপ ফুটিয়া আছে। অদূরে শোনা যাইতেছিল সমুদ্র তরঙ্গের গর্জ্জন-- বেলাভূমিতে ঢেউ আসিযা আছড়াইয়া পড়িতেছে। এই সুন্দর পথটি মাঝে মাঝে গভীর অরণ্যের মধ্য দিয়া চলিয়া গিয়াছে। দুই একটি পাহাড় ভীষণ জঙ্গলাকীর্ণ। এভাবে খানিকদূর গিয়া বাঁক ফিরিতে দেখা গেল রাস্তাটি প্রশস্ত হইয়া চালয়াছে। যে পাহা উপরদিয়া পথটি চলিয়াছে, সে পথটি বেশ চওড়া। সমুদ্রের দিকে বেশ খাড়াই, আবার কোন কোন স্থানে ঢালু হইয়া গিয়াছে। সূর্য্যের কিরণে সমুদ্রের জল আনন্দে নাচিতেছিল—তাহার বুকে যেন শত শত মণিরত্ন ঝলসিতেছিল।

রজত অভিভূতের মত সেখানে দাঁড়াইয়া চারিদিকের দৃশ্য দেখিতে দেখিতে যাইতেছিল।

সমুদ্রের ধারে ধারে জেলেদের কুটির। তাও বড় জোড় দশ বারো খানা। জেলেরা সমুদ্রের জলে মাছ ধরিতেছিল। প্রভাতের সেই উজ্জ্বলশ্রী ও বৈচিত্র পূর্ণ নির্জ্জন পথ রজতকে বিমুগ্ধ কারয়াছল।

সঙ্গের লোকটির নাম মিন্ডুন। মিন্ডুন পরিষ্কার বাংলায় বলিল: আর দূর নেই দাদাবাবু! পথের সামনে মোড়টা ফিরলেই আমরা বাড়ী পেঁাছে যাব।

রজত বলিল: না—না—সে কিছু নয়। আমার বেশ ভালই লাগছে।

মিন্ডুনের কথা সত্য। সম্মুখের মোড়টা ঘুরিতেই রজত দেখিতে পাইল, তাহাদের সম্মুখে একটা ছোট পাহাড়ের উপর প্রকান্ড পাথরের বাড়ী দাঁড়াইয়া আছে। বাড়ীর রংটা ধূসর। চারিদিকে ইটের খুবই উচু প্রাচীর। দেখিয়া মনে হয় যে বাড়ীটির ভিতরে অনেকখানি জমি পড়িয়া আছে। নীচের দিক হইতে বাড়ীর তোরণ পর্য্যন্ত পথটি ক্রমশঃ উপরের দিকে উঠিয়াছে। উঠিবার জন্য

বেশ প্রশস্ত প্রস্তরের সিঁড়ি আছে। সিঁড়িগুলিও প্রস্তর নির্ম্মিত। লোহায় তৈয়ারী মজবুত তোরণ। গেটের উপরে একটা পাথরের উপর বড় বড় অক্ষরে লেখা রহিয়াছে—"**যাদুপুরী**"।

মা-হেন পকেট হইতে একটা চাবি বাহির করিয়া গেটের দরজা খুলিয়া ফেলিল।

রজত জিজ্ঞাসা করিল—এ-বাড়ীর দরজা কি দিনরাত বন্ধ থাকে? তাহলে দাদুভাইয়ের সঙ্গে লোকজন কেমন করে দেখা করতে আসত বলুনত?

কেন, এই যে একটা ঘন্টা রয়েছে। যাদের দেখা করবার দরকার হয়, তারা ঘন্টা বাজিয়ে দিলেই দারোয়ান এসে দরজা খুলে দিত।

এসময়ে তারা বাড়ীর ভিতরকার পথে আসিয়া পড়িয়াছিল। মা-হেন আবার দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

মা-হেন বলিলেন—চলুন এবার সোজাসুজি বাড়ীর দিকে। আচ্ছা মাষ্টার সেন, আপনি কি কুকুর দেখলে ভয় পান? জানেন এ বাড়ীতে 'ডায়মন্ড' নামে একটা কুকুর আছে বোধ হয় সে এখন ছাড়া আছে দেখতে নেকড়ে বাঘের মত ভয়ংকর হলেও সে বেশ ভদ্রলোক! কোন ভয় করবেন না, দু'চার দিনের মধ্যেই আপনার সঙ্গে ওর বেশ ভাব হয়ে যাবে।

রজত হাসিয়া কহিল—না, না কোন ভয় করবো না। আমি কুকুর খুব ভালবাসি। জানেন, আমাদের বাড়ীতেও দুটো কুকুর আছে।

মা-হেন হাসিয়া বলিল—নাঃ ডায়মন্ড তার মনিবের নাতির গা শুঁকেই চিনে ফেলবে। এ-বাড়ীতে ডায়মন্ড আছে সে কমপক্ষে দশ বৎসর। আচ্ছা মাষ্টার সেন, এবার আমি বাড়ী যেতে চাই; অবশ্য যদি আপনি যেতে বলেন।

আমার সব বন্দোবস্ত—

সে ভাবনা আপনার করতে হবে না। মিন্ডুন সব ব্যবস্থা করে দিবে, আরও লোকজন আছেত!

মিন্ডুন হাসিয়া বলিল: দাদাবাবু, কিছু ভাববেন না। সব ব্যবস্থা আছে। আর আমি রয়েছি, যখন যা দরকার হবে বলবেন, করে দিব।

রজত বলিল:—মিঃ মা-হেন, তাহলে আপনি বাড়ী যেতে পারেন। কাল কখন আসছেন বলুনত!

বেলা দশটার সময় ঠিক্ আসবো। ও দিকেও কাজকর্ম্ম কিছু করতে হবে। আচ্ছা সুপ্রভাত! মা-হেন রজতের সঙ্গে করমর্দ্দন করিয়া দ্রুতগতিতে বাহিরের দিকে চলিয়া গেল।

রজত দেখিল—মা-হেন গেটের দরজা খুলিয়া বাহিরে চলিয়া গেল, এবং পুনরায় বাহির হইতে গেটের দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

বাড়ীর দিকে যাইবার দুইদিকে বড় বড় গাছপালা পথটিকে ছায়াশীতল করিয়াছে। বাড়ীর কাছাকাছি আসিতেই এতবড় একটা প্রকান্ড বাড়ীর নির্জ্জনতা দেখিয়া সে ভয়ে ও আতঙ্কে যেন শিহরিয়া উঠিতেছিল। তার বুক দপ্ দপ্ করিতেছিল।

রজত ভাবিতেছিল—কোথায় এলাম! চারিদিকের বড় বড় গাছপালার আড়ালে ধূসর রঙের এ-বাড়ীটা যেন এক অদ্ভুত ভীতিজনক বলিয়া মনে হইতেছিল। সে বাড়ীটির কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছে, এমন সময় একটা বিরাটাকার উল্ক হাউন্ড হাঁ করিয়া জিহ্বা নাড়িতে নাড়িতে তাহার দিকে ছুটিয়া আসিতে লাগিল। এই ভীষণাকৃতি কুকুরটিকে দেখিয়া রজতের মুখ একেবারে ছাইয়ের মত শাদা হইয়া গেল। কিন্তু সে নিভীকভাবে হাত বাড়াইয়া ডাকিল:—ডায়মন্ড! ডায়মন্ড!

কুকুরটা থমকিয়া দাঁড়াইল। রজত কাছে আসিয়া হাত বাড়াইয়া দিতেই ডায়মন্ড একবার তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রজতের হাত চাটিতে লাগিল।

রজত নিশ্চিন্তমনে কুকুরটির সঙ্গে বাড়ীর বিরাট দরজার কাছে আসিয়া পৌঁছিল।

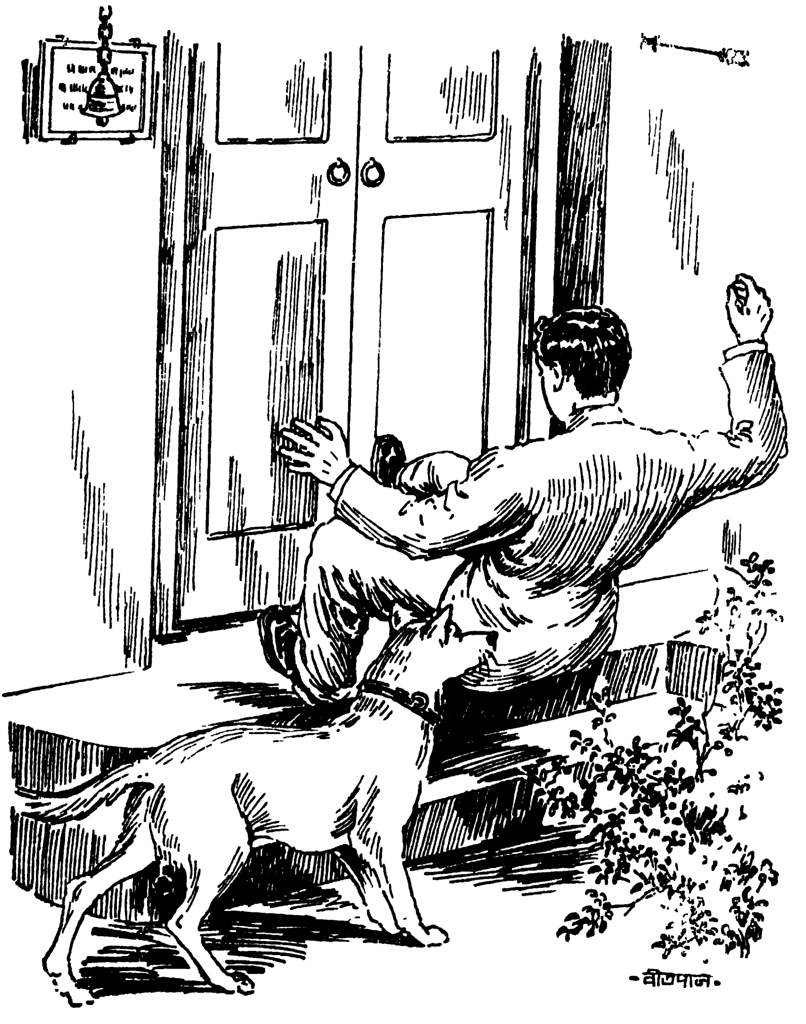
বাড়ীর প্রবেশ দরজার গায়ে বড় বড় অক্ষরে লেখা আছে—দরজায় ধাক্কা দিবে না—ঘন্টা বাজাও।

রজত হাসিয়া বলিল:—আচ্ছা সে দেখা যাবে। ঘন্টা পরে বাজান যাবে—দরজাটাতে ধাক্কা দিয়েই দেখা যাক না কি হয়!

রজত যেমন দরজার গায়ে ধাক্কা দিল—তৎক্ষণাৎ তাহার গায়ে একটা ভীষন ঝাঁকানি লাগিল কে যেন তাহাকে ধাক্কা দিয়া দশ হাত দূরে একটা ঝোঁপের মধ্যে ফেলিয়া দিল।

সহসা তাহার মুখ হইতে বাহির হইল—'**একি ভূতুড়ে বাড়ী**'?

রজত গা-ঝাড়াদিয়া উঠিয়া খানিক্ষণ ভীত ও চকিতভাবে দরোজাটার দিকে চাহিয়া রহিল। দেখিল হিস্ হিস্ করিয়া যে শব্দ হইয়াছিল তাহা একটা তীর নিক্ষেপের দরুন। দেয়ালের গায়ে সে তীরটা তীক্ষ্নভাবে বিদ্ধ হইয়া আছে। কিভাবে কোথা হইতে কে এইভাবে তীর ছুঁড়িল, কি তার উদ্দেশ্য সে তাহার কারণ নির্দেশ



ডায়মণ্ড আসিয়া দরজার পাশে সিঁড়িতে দাড়াইল

করিতে পারিতেছিল না। আর এতখানি বেলায় সেদিকে ভাবিবার মত মনের অবস্থাও তাহার ছিল না। শুধু এই কথাটিই তাহার মনে হইতেছিল যদি এমন সব অদ্ভুত ভীতিজনক ঘটনা এখানে ঘটে, তবে এ বাড়ীর নাম কেন যাদুপুরী হইল, সে প্রশ্ন কাহাকেও জিজ্ঞাসা করা হইবে সম্পূর্ণ অনাবশ্যক।

রজতের মনে একটা কৌতূহল জাগিল, কি করিয়া এরূপ একটা ব্যাপার ঘটিল। সে দরোজাটার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বেশ ভাল করিয়া চারিদিক লক্ষ্য করিল এবং কোনও সন্ধান না পাইয়া আবার দরজার কাছে গিয়া ধাক্কা মারিল, এবার কিন্তু সে কোনও আঘাত পাইল না— তখন রজতের মনে হইল যে এই দরজার মধ্যে হয়ত কোনরূপ কৌশল আছে সম্ভবতঃ কোন কল-কব্জা বা স্প্রিং আছে। ডায়মন্ড কুকুরটা রজতের পাশে দাঁড়াইয়া ঘন ঘন ল্যাজ নাড়িতেছিল।

রজত এইবার ঘন্টা বাজাইল। যেমন ঘন্টা বাজানো সঙ্গে সঙ্গে ডায়মন্ড আসিয়া দরজার পাশে সিঁড়ির উপর দাঁড়াইল।

দরজা খুলিয়া গেল। রজত দেখিল একটা লম্বা বারান্দা বহু দূর পর্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। ডায়মন্ড যেমন তাহার সঙ্গে সঙ্গে ভেতরে ঢুকিতে যাইতেছিল, এমন সময় একজন ভৃত্য আসিয়া ডায়মন্ডের শিকল টানিয়া তাহাকে বাহিরে লইয়া গেল।

রজত ভিতরে প্রবেশ করিবামাত্র একজন স্থূলকায়া বর্মী রমণী আসিয়া তাহাকে কি যেন প্রশ্ন করিল। রজত উত্তরে কহিলঃ হয় বাঙ্গলায় বলো, নতুবা ইংরাজী ভাষায় কথা বললে আমি বুঝতে পারবো। আমি এই মাত্র এ দেশে এসেছি। এ দেশের ভাষা আমি জানি না।

সেই প্রাচীনা স্ত্রীলোকটি তাহাকে বিনীতভাবে নমস্কার করিয়া বাঙ্গলাভাষায় কথা বলিল: উঃ আপনি! মাষ্টার রজত সেন। আমি প্রথমটায় আপনাকে বুঝে উঠতে পারি নি। হাঁ, আমি বাঙ্গলা জানি, ইংরেজীও জানি, যে ভাষায় ইচ্ছে কথা বলতে পারেন।

রজত নিশ্চিন্ত হইয়া কহিল, বেশ বাঙ্গলায় বলো।

বর্মী মহিলাটি রজত ভিতরে প্রবেশ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই বাহিরের দরজাটা বন্ধ করিয়া দিল।

বারান্দা দিয়া খানিকটা দূর অগ্রসর হইয়া সে একটা বড় হলঘরে

প্রবেশ করিল। সে বড় ঘরের বিশেষত্ব এই যে সেখানে বিদেশী কোন আসবাব পত্র ছিল না। ব্রহ্মদেশের শিল্পিগনের প্রস্তুত নানা সুন্দর কারুকলা-সম্পন্ন কাঠের সাজ-সজ্জায় ঘরখানি ছিল সজ্জিত।

বর্মী মহিলাটি তাহাকে সেখানে বসিতে বসিয়া কহিল—আপনার খাবার সব তৈরী আছে। আপনি কি এক্ষুনি খাবেন?

রজত কহিল: না। আমি স্নান করে পোষাক না বদলে খেতে যাব না। আমায় যে-ঘরে থাকতে হবে সে ঘরটা দেখিয়ে দিলে খুব ভাল হয়।

রজত এ-কথা বলিবার সময় সে বর্মী মহিলাকে বেশ ভাল করিয়া লক্ষ্য করিল। স্ত্রীলোকটিকে বৃদ্ধা বলিলেই ঠিক্ হয়। মাথার চুলগুলি একেবারে রুপার মত শাদা। মাথার উপরটা একখানি রেশমি রুমাল দিয়ে বাঁধা। মহিলাটি রজতকে কহিল—চলুন। আমার জিনিষপত্র সব?

সে অনেক আগেই আপনার ঘরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। এবার চলুন, আপনাকে সেখানে নিয়ে যাচ্ছি। বৃদ্ধা মহিলাটিকে অনুসরণ করিয়া রজত উপরে উঠিতে লাগিল। সিঁড়িটি বেশ চওড়া এবং শ্বেত-মর্ম্মর দ্বারা সুগঠিত। রজত উপরে উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে বর্মী মহিলাকে জিজ্ঞাসা করিল—আমার বোন কি বাড়ী আছে?

না, তিনি খাওয়া দাওয়া সেরে বাইরে একটু বেড়াতে গিয়েছেন এই সমুদ্রের দিকে। সমুদ্রের পারে বেড়াতে তিনি খুব ভালবাসেন কিনা!

রজতকে তাহার ঘরে পৌঁছাইয়া দিয়া মহিলাটি সেখানে দাঁড়াইয়া রহিল। রজত তাহার থাকিবার ঘরটি দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইল। বেশ বড় ঘর। মাঝখানে একটি সুন্দর খাটের উপর পরিপাটি ও পরিচ্ছন্ন ভাবে ধবধবে বিছানা পাতা। রজতের কিন্তু সবচেয়ে আনন্দ হইল একটি বড় শেল্ফ ভরা তাদের বয়সের ছেলে-মেয়েদের পড়িবার মত নানা জাতীয় প্রচুর বইয়ের সংগ্রহ দেখিয়া। শেল্ফটি দেয়ালের এক পাশে সুন্দর ভাবে সাজানো, আর বইএর সংখ্যাও অনেক, সব বইগুলিই ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে বাঁধানো ও তাদের গায়ে গায়ে সোনালি জলে লেখা সব নাম।

স্নান ও খাওয়া দাওয়ার কথা ভুলিয়া গিয়া সে শেলফটির কাছে ঝুঁকিয়া পড়িল।

এদিকে মহিলাটি তাহার স্নানের জন্য গরমজল ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি আনিবার জন্য সে-ঘর হইতে যখন বাহির হইবে সে সময় হঠাৎ রজত তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল:—আমার এখানে আসাটা বোধহয় তোমাদের ভাল লাগেনি, না? রজতের মনের মধ্যে আসিয়াছিল হঠাৎ একটা পরিবর্ত্তন। তাহার কাছে যেন এই পুরাণো বাড়ীটা আশ্চর্য্য রহস্যময় হইয়া উঠিতেছিল—তাহার মনে হইতেছিল, সে যেন নিজের বাড়ীতেই রহিয়াছে, বাড়ীঘর, জিনিষপত্র সবই যেন তার পরিচিত। সে যেন এ দেশেরই লোক, এদেশ তার প্রবাস নয়। সবই যেন তার আপনার। জানালার ভিতর দিয়া সে যে নীল আকাশের খানিকটা দেখিতে পাইতেছে, অই যে পাহাড়টার কালো চূড়ার উপর মেঘেরা আসিয়া স্বচ্ছ কুয়াসার সৃষ্টি করিয়াছে, এ যেন মায়াজাল।

বৃদ্ধা বর্মী দাসী কহিল,—সে কি কথা, মাষ্টার সেন। আপনার দাদামশায়ের বাড়ী কি আপনার নয়? আপনার দেশের লোকেরা নিজ দেশের প্রতি বড় অনুরক্ত। তারা অন্য দেশকে আপনার করে নিতে পারে না।

রজত হাসিয়া বলিল:—সেটা কি দোষের? তা অবশ্য নয়। বাঙ্গলাদেশের বাইরে যাদের দেশ, তারাও কি বাঙ্গলা দেশকে আপনার করে কখনও নিতে পারে?

তা অবশ্য ঠিক্। আমাকে ক্ষমা করবেন মাষ্টার সেন, ক্লান্ত আপনি, অনেক বাজে বকলুম। বসন্তের ফুল যেমন সকলের প্রিয়, তেমনি আপনি আপনার এ ঠাকুরদাদার বাড়ীর লোকজনের সকলেরই প্রিয় বন্ধু ও অতিথি। এ কথা বলিয়া সে চলিয়া গেল।

সে যাইবার সময় কহিল—আমার নাম মাথাং। কোন দরকার হলে আমাকে ডেকে পাঠাবেন। —নমস্কার!

রজত পথের ক্লান্তি ও অবসাদ দূর করিবার জন্য জামা কাপড় ছাড়িয়া তাড়াতাড়ি স্নান সারিয়া আসিল এবং আরামের নিঃশ্বাস ফেলিল। মাথার চুল আঁচড়াইয়া দিব্যি পরিপাটি বাবু সাজিয়া সে বেশ ভাল করিয়া বাড়ীর চারিদিক ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিতে লাগিল।

কোনের টেবিলের উপরকার গ্রামোফোনটা দেখিয়া উৎফুল্ল হইয়া উঠিল এবং যেমন একটা রেকর্ড দিতে যাইবে অমনি সে শুনিল কে যেন গম্ভীর শব্দে বলিতেছে—'সাবধান! গ্রামোফোন ধরো না।'

রজত বিস্মিত হইল। চারিদিকে লক্ষ্য করিল, ঘরের ছাত হইতে আরম্ভ করিয়া সবগুলি দেওয়ালের এদিকে সেদিকে এমনকি বইয়ের শেল্‌ফের পেছনটা দেখিল, কই কোথাও কেউ নেই। তবে কে কইল? তবে কি এই নির্জ্জন যাদুপুরীতে ভূতেরা সব থাকে নাকি? কোনও কিছুর সন্ধান না পাইয়া—সে নিজের মনে বলিল,—যাক গে! কাল এর খোঁজ নেওয়া যাবে। এখন খেয়ে আসি গে। একথা বলিয়া সে যেমন ঘরের বাহিরে হইল—অমনি সে শুনিতে পাইল বিকট হাসির ধ্বনি—হা—হা—হা—হি—হি—হি।

বাড়ীর ছাদ হইতে—বারান্দা হইতে—সব যায়গা হইতেই সেই বিকট হাসি—হা-হা-হা—হি-হি-হি!

নীচের খাবার ঘরে গিয়া খাইতে বসিয়া সে মাথাংকে বলিল—মাথাং এ বাড়ীতে কতগুলি ভূত থাকে?

মাথাং কহিল—কি বলবো মাষ্টার সেন,—এ বাড়ীটা যেন যাদুপুরী। জানেন—সময় সময় আমরা গভীর রাত্রিতে শুনতে পাই কে যেন বাঁশী বাজাচ্ছে! —আপনার দাদামশাই বলেন জেন ওসব কিছু নয়, তোমাদের কোন ক্ষতি করবে না। —হাঁ, আপনি কোন ভয় পাবেন না। দু'চার দিন থাকলেই বুঝতে পারবেন—ওসব কিছু ভয়ের নয়। আমরাত এখানেই থাকি, কোন অনিষ্টত আমাদের হয় নি। হাঁ আপনি রাত্রিতে কি খাবেন বলুন ত?

সে যে অনেক দেরী।

রজতের কথায় হাসিয়া মাথাং কহিল: বলুনত কয়টা বেজেছে? রজত খাবার ঘরের দেওয়ালে টাঙ্গানো ঘড়িটার দিকে চাহিয়া কহিল:—একি এযে পাঁচটা বেজেছে! তাইত, কি আশ্চর্য্য। মাথাং হাসিতে হাসিতে বলিল—শীতের বেলা অমনি করেই ঘোড়দৌড় খেলে! সে যাই হউক আমি রাত্রি আটটার মধ্যেই আপনার খাবার তৈরী করে রাখবো। আজ বেশী রাত্রি জেগে পড়াশুনা করবেন না যেন!

মাথাং একটি ছোকরা চাকরের হাত দিয়া রজতের শোবার ঘরে

একটি ল্যাম্প পাঠাইয়া দিল। ছেলেটি একেবারে ছেলে মানুষ—রজতের বয়সী হবে। বেশ ফুটফুটে চেহারা। মুখে হাসিটি লেগেই আছে।

রজত রাত্রিতে সামান্য কিছু খাবার পরে ল্যাম্পটি নিবাইয়া দিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল। শুইয়া শুইয়া ভাবিতে লাগিল কি কাপুরুষ সে! কিন্তু ঘরের মধ্যকার নিবিড় অন্ধকারে তাহার মনে আবার ভয়ের সঞ্চার হইল। মানুষ আলোতে কোন ভয় পায় না—ভয় পায় অন্ধকারে। সেই পৃথিবী—সেই পথ—ঘাট—সবই তেমনি থাকে, তবু মানুষ অন্ধকারে নানারূপ অলৌকিক ভয়ে চমকাইয়া উঠে! রজত মনের মধ্যে অনাবশ্যক ভূতের ভয়ে সংকোচিত হইয়া লেপ মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িল। রাত্রিটা তার আরামে কাটিয়া গেল।

পরদিন রজতের যখন ঘুম ভাঙ্গিল তখন তাহার ঘরের খোলা জানালার মধ্য দিয়া সূর্য্যের কিরণ আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে। বাহির হইতে শোনা যাইতেছিল মাথাংএর কন্ঠস্বর! উঠুন মাষ্টার সেন—অনেক বেলা হয়েছে যে!

রজত তড়াক্ করিয়া বিছানা হইতে নামিল এবং দরজা খুলিয়া যখন বাহির হইল—তখন চারিদিক সূর্য্যকিরণে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। প্রথমেই তাহার লক্ষ্য পড়িল সে বাড়ীর সম্মুখ দিকের ঘরে রহিয়াছে। বাড়ীর পেছনের নীল সাগরের নীল ঢেউ প্রলয় গর্জ্জনে বেলা ভূমিতে আসিয়া আছাড় খাইয়া পড়িতেছে।

— আট —

কে ঐ বালিকা

নূতন দেশের একটা আকর্ষণ আছে। মানুষ মাত্রেই প্রতিদিন প্রভাতের স্নিগ্ধ আলো, মধুর পুষ্প সুরভিত শীতল বাতাসের মধ্য দিয়া প্রাণে একটা নবীন উৎসাহ ও প্রফুল্লতার আবেশ অনুভব করে। —রজত সকাল বেলা উঠিয়া চারিদিকের নূতন সৌন্দর্য্য দেখিয়া প্রাণে একটা নূতন প্রেরণা লাভ করিল। তাহার আর চুপচাপ ঘরে বসিয়া থাকিতে ইচ্ছা হইল না। —সে তাড়াতাড়ি সাজিয়া গুঁজিয়া নীচে নামিয়া আসিল—এবং চায়ের টেবিলে একাই চা পান করিয়া বাহির হইয়া পড়িল। তাহার কাছে আশ্চর্য্য মনে হইল যে এখন পর্য্যন্ত তাহার বোনটির সহিত দেখা হইল না অথচ সে কি না আসিয়াছে তাহারই সঙ্গীরূপে।

বাহিরের প্রশস্ত সুন্দর বাগানের পথটি প্রভাতরবির সোনালি কিরণে ঝলমল করিতেছিল। তাহাকে বাগানের পথে আসিতে দেখিয়াই কোথা হইতে ডায়মন্ড কুকুরটা ছুটিয়া আসিয়া ল্যাজ নাড়িতে নাড়িতে হুঙ্কার করিয়া তাহার কাছে আসিল। রজত তাহার পিঠে ও গলায় হাত বুলাইয়া দেওয়াতে সে আনন্দে চীৎকার করিয়া সারাখানি বাড়ীকে মুখর করিয়া তুলিল।

রজত একাকী বাহির হইয়া পড়িল। সঙ্গে চলিল ডায়মন্ড। ডায়মন্ডের রক্ষক ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে ফিরাইয়া লইতে চেষ্টা করিলে কি হইবে? সে কিছুতেই ফিরিল না। ঘেউ ঘেউ করিতে করিতে এক লাফে ফটক এড়াইয়া রজতের সঙ্গে চলিল। কি তার আনন্দ! সে যেন অনেক দিন—অনেক দিন পরে বন্দীশালা হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে। রজতের আগে, কাছে সে ছুটিয়া চলিল। তাহারা পর্ব্বতের ঢালু পথ ধরিয়া সাগরের দিকে চলিল। প্রথমটি ক্রমশঃ বাঁকিয়া চলিয়াছে। একদিকে ছোটবড় পাহাড়। পাহাড়গুলি

ফুলে ফুলে ভরা। মৃদুমধুর বনফুলসৌরভ একটা মাদকতা আনিয়া দিয়াছে। পাহাড়ের গা হইতে কতকগুলি ছোটবড় ঝরণা ঝির্ ঝির্ ঝর্ ঝর্ শব্দ করিতে করিতে পথের উপরকার ছোট ছোট পুলের অন্তরাল দিয়া বেগে নীচের দিকে হইতে হইতে কোথায় কোন্ নিবিড় অরণ্যের শ্যামল কোলের গা বাহিয়া কোন্ দেশে চলিয়া গিয়াছে! —এদিকে গভীর অরণ্য অন্যদিকে পথের গায়ে গায়ে পাহাড়। পাহাড়ের গা কাটিয়া মানুষ যে সুন্দর পথ তৈয়ারী করিয়াছে সে পথের সৌন্দর্য্য প্রকৃতিও মানুষের যত্নে এক শোভন—শ্রী ধারণ করিয়াছে।

রজত প্রায় এক মাইল পথ চলিবার পর ঠিক সমুদ্রের কাছে একটি ছোট পাহাড় দেখিতে পাইল। পাহাড়টি ছোট হইলেও বন্ধুর এবং বেশ উঁচু—তাহার কতকটা অংশ একেবারে সমুদ্রের উপর গিয়া পড়িয়াছে। সমুদ্রের ঢেউয়ের আঘাত আসিয়া লাগিতেছে পাহাড়ের পায়ের তলায় তাহাতে ঝপাৎ ঝপাং—এইরূপ একটা শব্দ হইতেছে। দূর হইতে এই শব্দ শুনিয়াই সে ঐ দিকে আসিতে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল। —যে পথটি ধরিয়া সে এদিকে আসিতেছিল সেই পথটি সহসা পাহাড়ের ও অরণ্যানীর মধ্যাদিয়া—কোন্ দূর এক পল্লীর দিকে গিয়াছে—তার ক্ষীণ পদরেখা দেখা যাইতেছে—অস্পষ্ট, যেন সে অজানা পথিককে সেই বিপদসঙ্কুল অজানায় আহবান করিতেছে। ক্ষুদ্র হইলেও পাহাড়টি প্রায় তিন চারি শত ফুট উচ্চ। উঠিবার পথ বন্ধুর—শিলাকীর্ণ। দুই দিকে লতা ও গুল্ম আচ্ছন্ন করিয়া আছে। শিশির-ভেজা এবং ঝরণা-ঝরা জলের স্পর্শে পথটি পিচ্ছিল। সেই পথে কিশোর রজত পাহাড়ের উপর উঠিতে লাগিল। ডায়মন্ড লাফাইয়া তাহার অনুসরণ করিতেছিল। কোথাও বসিয়া কোথাও শুইয়া অতিকষ্টে লতানো গাছের শিকড় ধরিয়া প্রায় এক ঘন্টা পরে সে পাহাড়ের চূড়ায় একপাশে উঠিয়া পড়িল। সে জায়গাটি বড় সুন্দর—সমতল ও বড় বড় বৃক্ষ ও ধূসর প্রস্তর দ্বারা এমনভাবে ঐ স্থানটি শোভা পাইতেছে যে, সেখানে বসিবার, শুইবার ও বেড়াইবার পক্ষে চমৎকার। শুধু মাঝখানে একটি অজানা বড় গাছ শাখা প্রশাখায় চারিদিকে আপনাকে ছড়াইয়া দিয়া স্থানটিকে করিয়াছে ছায়াশীতল ও মনোরম।

গাছের নীচটি শষ্প শ্যামল—মনে হয় কে যত্ন করিয়া একখানি কোমল গালিচা পাতিয়া রাখিয়াছে। আর সেই উচ্চ সুন্দর সমতল ভূমি হইতে যোজনের পর যোজন বিস্তৃত বসুন্ধরার শ্যামল রূপ চোখে পড়ে। নিম্নে দক্ষিনে দিগন্ত প্রসারিত সমুদ্রের উচ্ছল নীল জল—নীল তরঙ্গ, অপার উদার নীল গগনের সহিত গিয়া মিশিয়াছে—সেখান হইতে সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়—স্থলভাগ কেমন করিয়া অর্দ্ধচন্দ্রাকারে অবস্থিত। পূর্ব্ব-উত্তর ও পশ্চিমের কোথাও সমুদ্রের সীমা, উত্তরদিকে অচঞ্চল মেঘমালার মত পর্ব্বত-শ্রেণী, শ্যামল নীল, ধূসর শোভায় ঢেউয়ের মত শোভা পাইতেছে—নীল আকাশ যেন পরম প্রীতিভরে তাহাদিগকে আলিঙ্গন করিয়া আছে। রজতের তরুণ কিশোর মন এখানে আসিয়া আনন্দে অধীর হইল। এমন সময় সে শুনিতে পাইল, পাহাড়ের কোন্ এক প্রান্ত হইতে অতি মিষ্ট সুর ভাসিয়া আসিতেছে; সে উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে লাগিল। এই নির্জ্জন পাহাড়ের বুকে বসিয়া কে গায় ওই! এ-যে বালিকার কোমল কন্ঠ! রজত শুনিতে পাইল বালিকার কন্ঠে গীত হইতেছে একটি অজানা জাতীয় সঙ্গীত—

জাগমা জাগ মা জননী
চির সুন্দর সুধা নির্ঝর কোটি সন্তানপালিনী।

সে সুরলহরী বায়ুতরঙ্গে নাচিতে নাচিতে আসিয়া তাহাকে বিমুগ্ধ করিতেছিল। কোথা হইতে কে গান করে তাহাকে দেখিবার জন্য সে উৎসুক হইয়া উঠিল! আবার সে শুনিতে পাইল—সেই সুরলহরী—

বিষাণ ভীষণ প্রলয় রবে
ডাকে এস জীবন-আহবে
উঠ জাগ সবে শোন না কি সবে ভারত জননীর বাণী?
জাগমা জাগমা জননী।

রজত যেদিক হইতে সুরলহরী ভাসিয়া আসিতেছিল, সেই দিকে চলিল। তাহার মনে হইল সমুদ্রের দিকে পাহাড়ের যে অংশটা ঝুকিয়া পড়িয়াছে, সেই দিক হইতেই শোনা যাইতেছে গান, কাজেই সে সেদিকেই চলিল। এ দিক দিয়া নীচে নামিবার পথটি বেশ ভাল,

অনেকটা পরিষ্কার। রজত সেদিকে খানিকটা নামিতেই দেখিতে পাইল—সেই ছোট পাহাড়টির গায়ে একটি শিলার উপর দাঁড়াইয়া তাহার চেয়ে তিন চার বৎসরের ছোট একটি মেয়ে সমুদ্রের দিকে চাহিয়া উচ্চৈঃস্বরে গান গাহিতেছে, সেই সুর লহরীই দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়িয়া একটা কৌতূহল সৃষ্টি করিয়াছে। মেয়েটির মাথায় কালো চুলগুলি বাতাসে দুলিতেছে—সাড়িখানি উড়িতেছে চঞ্চল বিক্ষিপ্ত ভাবে; তাহার দুইখানি বাহু যেন নবনীত শুভ্র. হেলিতেছে—দুলিতেছে গানের সুরে সুরে তালে তালে! কে এই বালিকা পরীর দেশে বাঙ্গলা গান গায়?

রজত ধীরে ধীরে বালিকাটির অনেকটা কাছে আসিতেই মেয়েটি তাহাকে দেখিয়া গান বন্ধ করিল, এবং চঞ্চলা মৃগ শিশুর মত অতি-দ্রুত সে পাহাড়ের পথে অদৃশ্য হইয়া গেল।

কে এই বালিকা? আশ্চর্য্য বটে! পথে চলিতে সে এমন দক্ষ যে মুহূর্ত্তে মধ্যে ছুটিয়া পলাইল তাহাকে অনুসরণ করা রজতের মত ছেলের পাহাড়ের বন্ধুর অজানা পথে কি সম্ভব?

বালিকাটি অতি দ্রুত পাহাড়ের অনেকটা নীচে নামিয়া গিয়া আবার গান আরম্ভ করিল। তাহার মাথার উপর উজ্জ্বল সূর্য্য কিরণ প্রতিভাত হইয়া দেখাইতেছিল যেন একটি দেব বালিকা এই নিভৃত বন প্রদেশে আসিয়া সুমধুর সুর-গুঞ্জনে সারা প্রভাতখানিকে করিয়া তুলিয়াছে আনন্দময়; যেন আনন্দের স্রোতধারা এই নির্জন প্রভাতটিকে করিয়াছে স্বপ্ন মোহাচ্ছন্ন। —রৌদ্র ঝলমল প্রভাতটি রজতের প্রাণে এই সঙ্গীতের তালে তালে করিয়া তুলিতেছিল কল্পনামুগ্ধ অনুসন্ধানী কিশোর! মেয়েটিকে রজত দূরে হইতে দেখিতে পাইয়াছিল যেন কে ছবি আঁকিয়া রাখিয়াছে প্রকৃতির এই সুন্দর আবেষ্টনীর মধ্যে. সুন্দর প্রভাত. মধুর সঙ্গীত. সুনীল গগন. বিহগের মধুর কূজন—এই প্রভাতটিকে করিয়াছিল স্বপ্নময়। —কে এই বালিকা! নিশ্চয় লইতে হইবে তার সন্ধান, সে তাহাকে অনুসরণ করিবেই! মন্ত্রমুগ্ধের মত সে পাহাড়ের পথটিকে লক্ষ্য না করিয়া যেমন নিম্নাভিমুখী একটি কৃষ্ণশিলার উপর পদক্ষেপ করিয়াছে—অমনি শিলাটি তাহাকে লইয়া স্থানচ্যুত হইল এবং পাহাড়ের সেদিকের কতকটা মাটি ও পাথর ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল! রজত

কাছের কতকগুলি গুল্মকে শক্ত করিয়া ধরিয়া আত্মরক্ষা করিতে চেষ্টা করিল। —কিন্তু বৃথা! সে কোনরূপেই আপনাকে রক্ষা করিতে পারিতেছিল না! —সে শূন্যে আশ্রয়হীন ভাবে দুলিতে লাগিল! লতাগুল্ম ধরিয়া আর কতকাল থাকা যায়! ডায়মন্ড ঘেউ ঘেউ করিয়া ডাকিতে ডাকিতে হঠাৎ কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া তাহার জামা কামড়াইয়া ধরিয়া টানিতে লাগিল। তবু রক্ষা নাই! নিম্নে যে কোন আশ্রয় নাই—প্রায় দুই তিন শত ফিট নীচে শিলাকীর্ণ সমুদ্রের বেলাভূমি! পড়িলেই যে নিশ্চিত মরণ! নিরুপায় রজত অবসন্ন হইয়া পড়িল এই বুঝি তার সব শেষ হইতে চলিল। তাহার হাত পা শিথিল হইয়া পড়িল।

রজতের এইরূপ বিপন্ন অবস্থা দেখিতে পাইয়া মেয়েটি যেখানে দাঁড়াইয়া আবার গান করিতেছিল, সেখান হইতে অতি দ্রুত ছুটিয়া আসিল এবং তাড়াতাড়ি রজতের অল্প দূরে যে একটি ছোট গাছ বেশ ডালপালা ছড়াইয়া দাঁড়াইয়াছিল তাহার একটা ডাল দুই হাত দিয়া টানিয়া রজতের দিকে নোয়াইয়া দিবার চেষ্টা করিয়া যখন পারিল না, তখন সে অতি দ্রুত ডালটির উপর চড়িয়া বসিয়া কোনরূপ রজতের হাতের কাছাকাছি শাখাটি নামাইয়া দিল। রজত এইবার ডান হাতে লতাটা জড়াইয়া রাখিয়া বাঁ হাত দিয়া গাছের ডালটা শক্ত করিয়া ধরিল এবং পলকের মধ্যে ডান হাতখানি দিয়াও ডালটি ধরিয়া উপরে উঠিবার সুযোগ পাইল, সময় মত মেয়েটিও তাহাকে সাহায্য করায় সে নিরাপদে গাছের তলায় আসিয়া পৌঁছিল এবং সন্তর্পণে শিলার উপর বসিল। গাছের ডালটা নোয়াইয়া নাবাইয়া দিতে সেই মেয়েটি প্রাণপণ শক্তি প্রয়োগ করিতে গিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এইবার দুইজনে নিরাপদ স্থানে আসিয়া পাশাপাশি বসিল। পাহাড়ের ঠান্ডা বাতাসেও তাহাদের গায়ের ঘাম দূর হয় নাই, দুই জনে হাঁপাইতেছিল। 'ডায়মন্ড' তাহাদেব পায়ের তলায় বসিয়া—ল্যাজ নাড়িতেছিল এবং মাঝে মাঝে ঘেউ ঘেউ শব্দ করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতেছিল।

প্রথমে কথা কহিল রজত,—দেখ ভাই, কুকুর মানুষের চেয়েও কৃতজ্ঞ। ডায়মন্ড যদি আমার জামা কামড়ে না ধরত, আর ঘেউ ঘেউ

করে না চেঁচাত, তাহলে তুমি জানতেও পারতে না আমার বিপদের কথা!

মেয়েটি ছল্ ছল্ চোখে কহিল—আমায় মাপ করো ভাই, আমি দৌড়ে না পালালেত কখ্খনো তুমি আমার দিকে ছুটে যেতে না!

রজত উঠিয়া দাঁড়াইল এবং হাসিয়া কহিল: থাক বিপদ কেটে গেছে! এখন আর ওসব কথা নিয়ে আলাপ করবার দরকার কি? উঃ বেঁচে গেছি, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ!



কে এই বালিকা? - ডালটা শক্ত করিয়া ধরিল

মেয়েটি কহিল--চল পাহাড়ের উপরে যাই, এযায়গাটা থেকে নীচের দিকে তাকালে আমার ভয়ানক ভয় হয়, মাথা ঘোরে।

বেশ, চল। তুমি কি আগে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে। আমি কোন্ ভাবে কোন্ দিক দিয়ে নেমে এসেছি, কিছুই ঠাহর করতে পারছি না।

—'না—এ দিকের পথটা বেশ ভাল। ও দিকটায় দু'পেয়ে পথ পাহাড়ের চূড়া পর্য্যন্ত উঠে গেছে। চল ঐ পথ ধরে যাই।

দুইজনে নিরাপদে পাহাড়ের অন্যদিকের শিখরের উপর গিয়া বসিল। এ যায়গাটি সত্যিই অতি মনোরম। সবুজ ঘাসে ভরা, আর ঘাসের গায়ে নানা জাতীয় বনফুল, সাদা, লাল, নীল, পীত কত রঙের যে ফুল ফুটিয়াছিল তার অবধি নাই।

একটি গাছের নীচে সবুজ ঘাসের উপর দুইজনে বসিল। প্রথমে কথা কহিল মেয়েটি।

তুমি ভাই কোথায় থাক? উঃ আমার জন্যেই না তোমার এমন বিপদ ঘটলো, আমি ছুটে না পালালেইত পারতাম।

আমি তোমাকে দেখছিলাম, আর তোমার মধুর গান শুনে ইচ্ছা হয়েছিল বেশ ভাল করে কাছে গিয়ে গানটা শুনি, আর তোমার সঙ্গে আলাপ করি, কিন্তু তুমিত ভাই আমাকে দেখে ছুটেই পালালে!

যাই বল ভাই, অমন ভাবে বোকার মত কি কেউ পাহাড়ের অজানা পথে দৌড়ে চলে! আর একটু হলেই হয়েছিল আর কি!

ডায়মন্ড হঠাৎ ঘেউ ঘেউ করিয়া একটা বুনো খরগোসের দিকে ছুটিয়া পালাইল।

একটি মেয়ের মুখে 'বোকা' কথাটা শোনা একজন কিশোরের পক্ষে যে কিরূপ লজ্জাজনক তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়! রজতের মনে হইল একটা অতৃপ্তির ভাব! কিন্তু মুখ ফুটিয়া কোন কথা না বলিয়া নীরবে মেয়েটির মুখের দিকে সে চাহিয়া রহিল।

মেয়েটি সুন্দরী। মাথা ভরা কালো চুল। রঙ খুবই ফর্সা। মুখখানা পদ্মফুলের মত হাসি ভরা টল্ টল করিতেছে। চোখের মধ্যে একটা দুষ্টুমির ভাব যেন ফুটিয়া উঠিয়াছে।

আচ্ছা ভাই, তুমি কোথায় থাক? একবারওত কোন উত্তর দিলে না!

—রজত কহিল, আমার নাম রজত সেন। বোম্বে থেকে এখানে এসেছি। —আমি ঐ যে পাহাড়ের গায়ে 'যাদুপুরী' নামে মস্তবড় বাড়ীটা আছে, আজ সবে দুদিন হলো, সেখানে এসেছি, সে বাড়ীতেই কিছু দিন থাকবো।

—তোমার নাম কি ভাই!

মেয়েটি হাসিয়া কহিল—আমার নাম তাইত! ভেবে বল্‌ছি।

ভারী দুষ্টু মেয়েত তুমি!

তাই নাকি! না—না—আমি খুবই ভাল মেয়ে! তাহলে নামটি বল।

আমার নাম—এই আমার নাম হচ্ছে—সুনীলা! মিছে কথা! যার রঙ হলো—শ্বেতপদ্মের মত ফর্সা, তার নাম হবে সুনীলা! বিশ্বেস হয় না!

মেয়েটি হা হা করিয়া হাসিল! ডায়মন্ড ও ঘেউ ঘেউ করিয়া উঠিল! তাহার মনের ভাবটা যেন এইরূপ, ওগো! বেলা বেড়ে যাচ্ছে! ক্ষিধে পায় না,—চল না বাড়ী যাই!

রজত বলিল সত্যি কথা বল। জানত বইয়ে লেখা আছে—'সর্ব্বদা সত্য কথা বলিবে।'

অসত্যত বলিনি! আমার বলা যদি বিশ্বাসই না কর, তবে জিজ্ঞাসা করাই বা কেন? —না আমি আর বস্‌বো না। বাড়ী চলে যাচ্ছি। অই যে ছোট বাড়ীটা দেখছো ওখানে আমি থাকি। চমৎকার দেখতে নয়! একেবারে সমুদ্রের ধারে ছোট পাহাড়টির উপর। সমুদ্রের ঢেউয়ের গর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ি।

বেশ ভাল লাগে তোমার এ দেশ?

নিশ্চয়! চমৎকার এদেশ। এখানে আমার দুই বন্ধু আছে জান। তাদের নাম হচ্ছে লীনা আর মীনা।

চল এবার নীচে যাই!

বেলা অনেক হয়েছে যে!

তখন সূর্য্য মাথার উপরে উঠিবার উপক্রম করিতে ছিল।

দুইজনে নামিয়া চলিল।

ডায়মন্ড কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া তাহাদের আগে আগে চলিল।

মেয়েটি জিজ্ঞাসা করিল—তুমি এখানে এসেছ কেন?

রজত বলিল, আমার এক বোন থাকে এখানে ঐ যাদুপুরীতেই, আমার মাসীমার মেয়ে মীরা, সে একা থাকে কিনা, তাই দাদু আমাকে লিখে পাঠিয়েছিলেন, এখানে এসে কিছুদিন তার সঙ্গে থাকতে, তিনি গেছেন মিশর দেশে ব্যবসায়-বাণিজ্য সম্পর্কে কাজ করতে। তাই যক্ষের মত অত বড় নির্জ্জন পুরীতে থাকতে হবে।

তোমার সে বোনের নাম কি বলত?

মীরা। তুমি তাকে চেন নাকি?

চিনতেও পারি। দেখতে কত বড় হবে!

রজত মেয়েটির দিকে লক্ষ্য করিয়া কহিল:—বোধহয় তোমার মতই হবে। অনেক দিন দেখি নাই কিনা!

বেশ, একদিন তোমাদের বাড়ী গিয়ে আলাপ করে আসবো! কেমন!

—রজত বিষণ্ন মনে কহিল, দুদিন হল এখানে এসেছি এ পর্য্যন্ত তার দেখাই পেলাম না!

মেয়েটি গম্ভীর ভাবে কহিল, ভারি আশ্চর্য্যত!

এমন সময়ে অদূরে একটি বর্ম্মদেশীয় ছোট ছেলেকে দেখিতে পাইয়া মেয়েটি কহিল—অইদেখ, আমার বাড়ী ফিরতে দেরী হয়েছে বলে, লোক এসেছে, আমি যাই ভাই!

মেয়েটি অতি দ্রুতপদে রজতের কাছ হইতে ছুটিয়া পালাইল। কোথায় কোন্ পথে সে গেল, সে দিকে রজত আর লক্ষ্য করিবার সুযোগ করিতে পারিল না—সে যখন যাদুপুরীতে আসিয়া পৌঁছিল, তখন সেখানকার বড় ঘাড়িটাতে ঢং ঢং করিয়া এগারোটার ঘণ্টা বাজিল।

—এগারো—

রজত ও মীরা

রজত ফিরিবার পথে আপনার মনে বলিতে লাগিল—এই
ীর কি চঞ্চল গতি—দেখিতে দেখিতে অদৃশ্য হইয়া গেল।

সে খানিক দূরে যাইতেই ডানদিকে একটি রাস্তা দেখিতে পাইল। তাহার কৌতূহলি মন সে পথটি ধরিয়া চলিতে চলিতে একটি পুরাণো বাড়ী দেখিতে পাইল। বাড়ীটি খুব পুরাণো, অতি জীর্ণ অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। পাথরে গড়া এই বাড়ীটির সম্মুখে দাঁড়াইয়া রজত বিশেষ মনোযোগসহকারে লক্ষ্য করিতে লাগিল—বাড়ীটির গড়ন এবং কতদিনের পুরাণো এ বাড়ীটা তাহার একটা অনুমান করিতে। সে লক্ষ্য করিল বাড়ীর উপরকার খিলানের উপর বর্মী অক্ষরে কি যেন লেখা রহিয়াছে, লেখাগুলি অস্পষ্ট হইলেও পড়িতে পারা যায়। কিন্তু সেত বর্মী ভাষা জানে না পড়িবে কিরূপে?

এমন সময় দেখিতে পাইল একজন বর্মন ভদ্রলোক সেদিকে আসিতেছেন। তাঁহার পোষাক-পরিচ্ছদ দেখিলেই মনে হয় তিনি একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। মুখে তাঁর একটা লম্বা চুরুট। ভদ্রলোকটি রজতের কাছে আসিয়া ইংরাজীতে জিজ্ঞাসা করিলেন,—আপনি কি দেখছেন? রজত প্রতি নমস্কার করিয়া কহিল—এ পুরাণো বাড়ীটা দেখছি; এ বাড়ীটা কতদিনের পুরাণো বলতে পারেন?

ভদ্রলোক হাসিয়া বলিলেন—নিশ্চয়ই পারি।

তারপর বলিতে লাগিলেন—একদিন এই বাড়ী ছিল—একদল স্বাধীনতাকামী বিদ্রোহী বর্মনদের প্রধান মিলনস্থল, তারা চেয়েছিল, অত্যাচারী রাজা থিবোর বিরুদ্ধে একটা ষড়যন্ত্র করে দেশে গণতন্ত্র শাসন প্রতিষ্ঠিত করতে, এ বাড়ীটা ছিল তাদের প্রধান আড্ডা।

রজত ভদ্রলোকের সঙ্গে বাড়ীর ভিতরে ঢুকিয়া চারিদিক ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিতে লাগিল—বাড়ীর দেয়াল ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, ইট-পাথর এখানে সেখানে বিক্ষিপ্ত পড়িয়া আছে। প্রকান্ড বাড়ী। ঘর দোর সব ভাঙ্গা, সাজ-সরঞ্জামগুলি পড়িয়া আছে—দুর্গন্ধের জন্য ঘরের মধ্যে কাহারো পক্ষে বেশিক্ষণ থাকা অসম্ভব। —চারিদিকের বড় বড় গাছপালা যেন একটা মহা আতঙ্কের সৃষ্টি করিয়াছে। সেখানে নিশ্চিত মনে নানা বন্য-পশুরা বাস করে—তাহাদের সামনেই একটা সাপ তাহার লকলকে দীর্ঘ জিহবা বাহির করিয়া একটা ভাঙ্গা ইটের পাঁজার মধ্যে লুকাইয়া গেল!

ভদ্রলোক হাসিয়া কহিলেন—আপনি ছেলেমানুষ, আপনার এমন এ্যাডভেঞ্চার ভাল লাগতে পারে, কিন্তু আমি বিনা প্রয়োজনে এইভাবে সাপ-বাঘের মুখে প্রাণ দিতে রাজি নই। এই কথা বলিয়া তিনি খুব জোরে চুরুট টানিতে টানিতে রজতের হাত ধরিয়া তাহাকে সহ অতি দ্রুত আসিয়া রাস্তায় দাঁড়াইলেন। তারপর চলিয়া যাইবার উদ্যোগ করিতেই রজত কহিল: কই আপনি দরজার উপরে কি লেখা আছে তাত বল্লেন না। ভদ্রলোক হাসিয়া বলিলেন-তাইত! তারপরে অক্ষরগুলির দিকে অভিনিবেশ সহকারে তাকাইয়া বলিলেন—লেখা আছে :

'বাহুতে শক্তি, বাক্যে সত্য, হৃদয়ে ঐক্য' ইহাই হউক আমাদের কর্ত্তব্যপালনের মূল মন্ত্র।

ভদ্রলোক কহিলেন—এবার আমি যাই। আমাকে দুদিনের মধ্যেই রেঙ্গুন ফিরতে হবে, এখানে ছুটিতে বেড়াতে এসেছিলাম। আপনি কোথায় এসেছেন?

রজত হাসিয়া কহিল—ঐ যে বাড়ীটা, যার নাম যাদুপুরী—ও বাড়ীটাতে!

বাই জোভ্—সেই বুড়ো পাগলাটে ভদ্রলোকের বাড়ী। তিনি কি এখানে নেই? জানেন তিনি প্রকান্ড একজন বড়লোক, কিন্তু বড় অদ্ভুত ধরনের খেয়ালি লোক। এমন ভাবে চলা ফেরা করেন যে কিছু বোঝবার যোই থাকে না। আপনার সঙ্গে তাঁর কি সম্পর্ক?

আজ্ঞে তিনি হচ্ছেন আমার দাদু, আমার মায়ের বাবা।

তাই নাকি! —বেশ, কদিন থাকবেন? আপনার দাদু যদি

এখানে থাকেন, তবে চলুন তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করে আসি। অনেকদিন একসাথে রেঙ্গুনে ছিলাম।

রজত কহিল, আমার দাদুভাই,—ঈজিপ্টে ব্যবসায় উপলক্ষে চলে গেছেন—ফিরতে ছ'মাস ও হতে পারে এক বছরও হতে পারে। আমার এক ছোট মাস্তুত বোন এখানে আছে—ছেলে মানুষ কিনা, তাই আমাকে এখানে আনিয়েছেন আমরা দুজনে একসঙ্গে থাকবো বলে।

বেশ, আমি বিকেলের দিকে যদি সময় পাই তবে আপনাদের সঙ্গে দেখা করতে যাব। একথা বলিয়া ভদ্রলোক অন্য পথে চলিয়া গেলেন।

রজত এইবার বাড়ীর পথ ধরিল এবং অল্প সময়ের মধ্যেই দাদুপুরীতে ফিরিয়া আসিল।

সে বড় দরজাটার কাছে দাঁড়াইয়া লক্ষ্য করিল,—সেই দরজার সম্মুখের ঢাকনি দেওয়া বাক্সটির দিকে, সে মনে মনে স্থির করিল, যে করেই হউক—এ বাক্সটা খুলে দেখতে হবে, কি কলকব্জা আছে এর ভিতর—সেজন্যে তাকে পেতে হ'ল একটা আঘাত। রজত বরাবরই কলকব্জা লইয়া নাড়াচাড়া করিতে ভালবাসিত, সে এইখানে আসিয়া পাইল সে বিষয়ে অনুসন্ধান করিবার প্রচুর সুযোগ। বাক্সটির দিকে বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিয়া রজত উপরে চলিয়া গেল।

বেলা তখন বারোটা বাজিয়াছিল। সে সিঁড়ি বাহিয়া যেমন তাহার ঘরের দরজার পাশে আসিয়াছে তখন শুনিতে পাইল কে যেন বলিতেছে—'এক্ষুনি চলে যাও—বলছি, এ বাড়ীতে থাকলে ভাল হবে না' সঙ্গে সঙ্গে বিকট অট্টহাস্য।

রজত থমকিয়া দাঁড়াইল। বালক ভৃত্যটি তাহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল সে কহিল,—দেরী করবেন না, খেতে চলুন।

রজত ঘরের ভিতর ঢুকিয়া জামা কাপড় ছাড়িয়া প্রস্তুত হইতেছে, এমন সময় শুনিতে পাইল—কে যেন আবার বলিয়া উঠিল 'বলছি বাড়ী ছেড়ে যাও! যদি থাক ভাল হবে না বলে রাখছি'। কি কর্কশ স্বর!

রজত এইবার রীতিমত ভয় পাইল। এখনত আর রাত্রি নয়,

দিন দুপুরে প্রখর রৌদ্রালোকে উজ্জ্বল দিনের বেলায় একি এ ভূতুড়ে কান্ড!

নির্ভীক রজত মনে মনে স্থির করিল, যে ভাবেই হয়—এই অজ্ঞাত বাণীর সন্ধান করিতে হইবে! না—না কখনও সে ভীত হইবে না। তাহার বৈজ্ঞানিক কিশোর মন ভয়ের পরিবর্ত্তে সত্যের সন্ধানে ব্যগ্র হইয়া উঠিল।

সে ধীরে ধীরে নীচে যাইবার সময় বালক ভৃত্যটিকে জিজ্ঞাসা করিল;—আমার বোন মীরা কোথায়? আজওত তার সঙ্গে দেখা হল না।

বালকটি হাসিয়া কহিল,—দিদিমণিকে আমরাই কি বড় একটা দেখতে পাই? কখন যে কোথায় যান খুঁজে পাওয়াই ভার।

কথা বলিতে বলিতে—খাবার টেবিলের কাছে আসিতেই সে দেখিতে পাইল কে যেন একটি মেয়ে দ্রুত ছুটিয়া পালাইল।

রজত হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল এবং সেদিকে লক্ষ্য করিয়া—বারান্দার দিকে যাইতেই দেখিতে পাইল, সেই সমুদ্রের তীরে পাহাড়ের উপর যে মেয়েটির সঙ্গে তাহার দেখা হইয়াছিল—সে মেয়েটিই আরামকেদারার উপর বসিয়া একখানি বই পড়িতেছে। তাহার কালো কোঁকড়ান চুলগুলি মাথার দুই দিক দিয়া এলাইয়া পড়িয়াছে। রজতের পায়ের শব্দ শুনিয়া সে বইখানি রাখিয়া যেমন উঠিতে যাইবে, তৎক্ষণাৎ রজত তাহার হাতখানি শক্ত করিয়া ধরিয়া কহিল—কে তুমি বলত? —

মেয়েটি কহিল, হাত ছাড় বড্ড লাগছে! কি যে করো ভাই!

কিছুতেই ছাড়বোনা, যদি তুমি সত্যি করে না বল তুমি কে?

বলেছিত আমি সুনীলা!

মিথ্যা কথা।

তুমি লোকটিত বড় ভাল নও ভাই, একজন ভদ্রলোকের মেয়েকে বলো মিথ্যাবাদী!

বলবোনা! একশোবার বলবো! বুঝতে পেরেছি—ঠিক তুমি মীরা! এইত তোমার গালের সেই সুন্দর তিলটি!

মীরা একরাশ ঝরা শেফালির মত মিষ্টি হাসি হাসিয়া কহিল, তুমি আমায় চিনতে পারোনি কেন, রজত দা!

কয়েক বছর পর দেখলুম কিনা। —তুমি এখন অনেকটা বড় হয়েছ; মুখের আদল বদলে গেছে, আর দেখতে হয়েছ চমৎকার!

মীরা মাথা নীচু করিয়া হাসিয়া কহিল, তুমিও কিন্তু রজত দা, এ কয় বছরের মধ্যে বেশ সুন্দর হয়েছ। লম্বা হয়েছ।

আচ্ছা ভাই—মীরা, আমি বিদেশী মানুষটা কোন্ দূর বোম্বে হতে এলাম, তুমিত আমার একটু খোঁজও করলে না?

আর তুমিই কি আমার খোঁজ করেছ? যদি করতে তবে নিশ্চয়ই আমাকে দেখতে পেতে!

তারপর দুইজনে হাসিতে হাসিতে খাবার ঘরে আসিল!

দুই ভাই ভগ্নীর—এই মিলনটি হইল মধুর।

— বারো —

শত্রুর কবলে

সেদিন মীরার সঙ্গে সারাটা দুপুর নানা আলাপ ও আলোচনায় রাতের সময়টা বেশ কাটিয়া গেল। না, মীরাত আর সেই কথায় কথায় কাঁদুনি মেয়ে আর নাই। তবে এখনও সে আগেরি মত চঞ্চলা রহিয়াছে। —কথা বলিতে বলিতে হঠাৎ ছুটিয়া পালায়, যাদুপুরীর বৃহৎ বাড়ীটির প্রত্যেকটি ঘর তাহার কাছে এমনি জানা হইয়া গিয়াছে যে রজত এখনও তেমনভাবে পরিচিত হইতে পারে নাই।

এখন দুইজনে একসঙ্গে বেড়াইতে বাহির হইত। পরের দিন বিকেল বেলা রজত ও মীরা সমুদ্রের বালিময় সৈকতে রাশি রাশি ঝিনুক ও ছোট ছোট শংখ কুড়াইয়া—তারা মাছ ধরিয়া—বেড়াইতে লাগিল।

বেলা শেষে মিঃ মাহেন সমুদ্রের ধারে আসিয়া কহিল:—মিঃ সেন আমি আপনাদের যাদুপুরীতে খুঁজে এখানে এসেছি। তারপর রজতের পকেট ভর্ত্তি একরাশ ঝিনুক ও শংখ দেখিয়া হাসিয়া কহিল: সাবধান মিঃ রজত, আপনি এ দেশে সবে নূতন এসেছেন. পথ ঘাটও ভাল করে জানা নেই. হঠাৎ কখন সমুদ্রের জোয়ার এসে পড়ে তাত জানেন না, সে প্রবল উচ্ছ্বাসের বেগে কোথায় ভেসে যাবেন! চলুন পথের উপর দিয়ে বেড়াই! জানেনত আপনার ভাল মন্দ সব দিকেই আমার নজর রাখতে হবে।

রজত কহিল, আচ্ছা চলুন!

মীরা হাসিতে হাসিতে কহিল,—আমি কিন্তু কিছু ভয় পাইনে মিঃ মাহেন। সমুদ্রের জোয়ার কখন আসে সে বেশ বুঝতে পারি।

তা'ত পারেন, তাহলেও আমি জানি যে খুব অভিজ্ঞ লোকেরাও জোয়ারের জলের বেগে ভেসে গিয়ে প্রাণ হারিয়েছে। মানুষের

পৃথিবীতে বাস করতে হলে সর্ব্বদা আপনার দিকে লক্ষ্য রেখে চলতে হয়।

মীরা কথা কহিল না।

একথা বলিতে বলিতে তাহারা সমুদ্রের তীরের ছোট পাহাড়টির গা দিয়া যে পথটি রাস্তার উপর গিয়া মিশিয়াছে, সেখানে আসিল:— এমন সময় মিঃ মাহেন কহিল, বেড়াবার পর চলুন আমার বাড়ী, সেখানে আজ আপনাদের চা পান করতে হবে, আমি আপনাদের সে কথা বলতেই এসেছিলাম।

মীরা হঠাৎ বলিল—রজতদা, এখানে একটু তোমরা দাঁড়াও না ভাই, তারপর হাততালি দিয়া আনন্দে নাচিতে নাচিতে কহিল— দেখছো পাহাড়টার চূড়ার উপর কি সুন্দর ওই লালরংয়ের ফুলটি ফুটে রয়েছে, আমি ওই ফুল কতকগুলো নিয়ে আসি গে! একথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই মীরা হরিণের মত বেগে পাহাড়ের উপর উঠিয়া গেল। রজত আশ্চর্য্য হইয়া গেল তাহার ক্ষিপ্রগতিতে, অতিশয় ভয়সংকুল ও দুরারোহ স্থানগুলি ও সে অতি সহজে অতিক্রম করিল—এবং আধঘন্টার মধ্যেই একরাশ অনামী বনফুল লইয়া আসিল। সেগুলি দেখিতে যেমন সুন্দর—তেমনি তাদের একটা মন মাতানো প্রাণ ভুলানো উগ্র সৌরভ তাহাদিগকে মোহিত করিয়াছিল।

রজত বলিল:—মীরা তোমার লাগেনিত কোথাও?

হাঁ খুব—খু—উ—ব লেগেছে বীরপুরুষ মশাই! জানত—

কাঁটা হেরি ক্ষান্ত কেন কমল তুলিতে

দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহীতে!

রজত হাসিল। মিঃ মাহেন কহিল—বেলা পড়ে এসেছে, চলুন এইবার আমাদের বাড়ী।

মিঃ মাহেন তাহাদের দুই ভাইবোন্‌কে লইয়া তাহার বাড়ীর দিকে চলিল। একটি বনের মধ্য দিয়া পথটি চলিয়া গিয়াছে। এইখানে মানুষ যে বেশী যাতায়াত করে তাহা নহে। মীরা চুপিচুপি রজতকে কহিল—আমরা কিন্তু চা খেয়েই বাড়ী ফিরে আসবো একটুও বিলম্ব করবো না! দেখছোত আমি একটা

পাতলা ব্লাউস পরে এসেছি, সন্ধ্যার পর জান রজতদা রীতিমত ঠান্ডা পড়ে তাই তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরতে হবে।

রজত কহিল—আমিও ভাই বেশীক্ষণ থাকবো না।

মিঃ মাহেন তাঁহার হাতের লাঠিখানা ঘুরাইতে ঘুরাইতে পথ চলিতেছিল। বন পার হইতেই দেখা গেল একটা প্রকান্ড মাঠ। মাঠের পূর্ব্বদিকে কয়েকখানা বাড়ী, সে বাড়ীগুলি লইয়াই হইতেছে বর্মনদের একটি পল্লী।

তাহারা তিনজনে মাহেনের বাড়ী আসিল। মাহেনের দু'টি বোন তাহারা মীরারই সমবয়সী হইবে পরম সমাদরে মীরাকে ও রজতকে গ্রহণ করিল। মাহেন বলিল—এদুটি তাহার যমজ বোন, মাতৃহারা; কিন্তু তারা সংসারের যেমন সব কাজ করে তেমনি বৃদ্ধ পিতার সেবা শুশ্রূষায় ব্যস্ত থাকে। চলুন আমার বাবার কাছে।

মাহেন রজত ও মীরাকে তাহার বাবার ঘরে লইয়া আসিল। সুন্দর ছোট ঘরখানি। একখানি কারুকার্য্যখচিত খাটের উপর একজন বৃদ্ধ অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় শুইয়া একখানি বই পড়িতেছিলেন। মাহেন রজত ও মীরাকে তাহার পিতার সঙ্গে পরিচিত করিয়া দিলে পর তিনি হাসিয়া উভয়ের মাথায় হাত বুলাইয়া দিলেন এবং অস্ফুট স্বরে বুদ্ধের নাম উচ্চারণ করিয়া উভয়ের মঙ্গল কামনা করিলেন। সায়াহ্নের স্বর্ণোজ্জ্বল রৌদ্র দীপ্তি জানালার ভিতর দিয়া আসিয়া ঘরখানিকে দীপ্তিময় করিয়াছিল, কক্ষমধ্যে সুরভি গোলাপ ও অন্যান্য ফুল পুষ্পদানীতে ছিল বলিয়া ঘরখানিকে স্নিগ্ধ ও মধুর গন্ধে প্রফুল্ল করিয়া তুলিয়াছিল।

বৃদ্ধ পিতার কাছে আসিয়া মাহেন খুব জোরে মিঃ গুপ্তের এই নাতি ও নাতিনীর সম্বন্ধে অনেক কথা বলিলে পর বৃদ্ধ হাসিতে লাগিল এবং বারবার তাহাদের দিকে লক্ষ্য করিতে লাগিল। রজত ও মীরাকে লইয়া এইবার সকলে চায়ের টেবিলে আসিল। সেখানে আসিয়া রজত দেখিল একজন পাদ্রী সাহেব সেখানে বসিয়া আছেন। বয়স ষাটের উপর বেশ বলিষ্ঠ। তিনি অত্যন্ত উৎসাহের সহিত দাঁড়াইয়া উঠিয়া উভয়ের করমর্দ্দন করিয়া বলিলেন—নমস্কার! ব্রাদার রজত, নমস্কার সিস্টার মীরা। আমি বন্ধু মাহেনের কাছে

আপনাদের কথা শুনেছি। বেশ ভাল আছেনত? এদেশ ভাল লাগছেত?

রজত কহিল: আপনিত বেশ পরিষ্কার বাংলা বলেন। বাংলা দেশে ছিলেন নাকি?

মিঃ মাহেন কহিলেন—ফাদার লগসডেল সাহেব বাংলা, বিহার, সাঁওতালপরগণা ও ওড়িষ্যায় ছিলেন অনেকদিন—ওসব দেশের ভাষাও যেমন জানেন তেমনি বর্মন ভাষা এমন পরিষ্কার বলেন যে—আমরাও অমন সুন্দরভাবে বলতে পারি না—

ফাদার লগসডেল চুরুট টানিতে টানিতে কহিলেন—মিঃ মাহেন আমাকে একটু বাড়িয়ে বলেন। —তারপর কহিলেন আপনার দাদুভাই আমার অনেকদিনকার পুরাণো বন্ধু, বাংলাদেশে, ওড়িষ্যায় নানা যায়গায় তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ হওয়ার সুযোগ হয়েছিল। একদিন আপনাদের আমি আমাদের গীর্জায় নিয়ে যাব এখানকার ছেলেমেয়েদের স্কুল, হাতের কাজ, ছবি আঁকা সব দেখে আসবেন!

ধীরে ধীরে গল্পগুজবের সঙ্গে সঙ্গে—চা'পান শেষ হইল। —মীরা- ব্যস্ত হইয়া পড়িল বাড়ী যাইবার জন্য। ফাদার লগসডেল কহিলেন:—বেশত আমি মীরাকে বাড়ী পৌছে দিব, মীরা কহিল ধন্যবাদ ফাদার! আমার বড় শীত বোধ হচ্ছে! —তারপর সে ঘাড় ফিরাইয়া মাহেনের বোন্‌দের নমস্কার করিয়া এবং মাহেনকে নমস্কার জানাইয়া—ফাদার লগসডেলের সঙ্গে চলিয়া গেল।

রজত মাহেনের সঙ্গে নানা বিষয়ে গল্প করিতে করিতে অনেকক্ষণ সময় কাটাইয়া দিল এবং স্থির হইল যে আশেপাশে যাহা কিছু দেখিবার আছে সে সমুদয় একে একে দেখাইবেন, কেননা একেবারে চুপচাপ করিয়া ঘরে বন্দী হইয়া থাকা রজতের অভ্যাস নহে, কাজেই সে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল—এই নূতন দেশের নূতন নূতন অজানা অঞ্চলে বেড়াইবার জন্য—ভ্রমণের নেশা তাহাকে প্রগাঢ় ভাবে পাইয়া বসিয়াছিল। রজত বাড়ী ফিরিবার উদ্যোগ করিতেই—মিঃ মাহেন কহিল,—চলুন আপনাকে এগিয়ে দিয়ে আসি!

রজত কহিল, কি যে বলেন? আমিত আর মীরা নই যে ভয় পাব। এমন সুন্দর সন্ধ্যা! কি সুন্দর দিন্‌টি।

রজত নীরবে সমুদ্রের শীতল বাতাসে স্নিগ্ধ ও প্রফুল্ল চিত্তে—

সেই বনপথ ধরিয়া যাদুপুরীর দিকে চলিল। পথটি নির্জ্জন। বনের গাছপালাগুলি দৈত্যের মত দাঁড়াইয়া বনটিকে করিয়া তুলিয়াছে ভয়সংকুল। পাখীদের পাখার ঝাপটা বনের মধ্যে শুধু একটা শব্দ ধবনিত করিয়া তুলিয়াছিল।

সে যখন বনের মধ্যস্থলে আসিয়া পৌছিল,—এমন সময় অনুভব করিল কে যেন পেছন হইতে আসিয়া তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া তাহাকে টানিয়া মাটিতে ফেলিয়া দিল এবং তাড়াতাড়ি রজতের



কে যেন পেছন হইতে গলা জড়াইয়া মাটিতে ফেলিয়া দিল

বুকের উপর হাটু দিয়া চাপিয়া বসিয়া—মুখখানি রুমাল দিয়া বাঁধিয়া ফেলিল—সে কোনরূপেই শব্দ করিতে পারিতেছিল না। সে কোনরূপেই আপনাকে মুক্ত করিতে পারিতেছিল না, সে তাহার তরুণ শক্তিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিল এই ভীষণ আক্রমন হইতে মুক্তি পাইবার নিমিত্ত। বহুক্ষণ ধস্তাধস্তির পর নিজেকে সে অনেকটা মুক্ত করিয়া লইল। মুখের রুমালটাও সরাইয়া ফেলিতে পারিয়াছিল।

এমন সময় সেই লোকটা অত্যন্ত কর্কশ এবং অস্পষ্ট স্বরে কহিল:—সাবধান! যদি তুমি ভারতবর্ষে তাড়াতাড়ি ফিরে না যাও তাহলে তোমার ভীষণ বিপদ ঘটবে!

রজত সহসা দাঁড়াইয়া দৃঢ়কন্ঠে কহিল—না—না কখনো যাব না। একথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই সে ভীষণ ভাবে সেই লোকটার দিকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইয়া তাহার মুখের উপর একটা ঘুসি বসাইয়া দিয়া ছুটিয়া গেল।

কিন্তু কোথায় সে! গভীর বনের মধ্য দিয়া রজতের আক্রমণ-কারী শত্রু দ্রুতপদে পলায়ন করিল। বনপথে শুষ্কপত্র রাশির মধ্য দিয়া জাগিয়া উঠিল একটি মর্ম্মর ধ্বনি!

—তেরো—

সাবধান সম্মুখে আরো বিপদ

রজত গা ঝাড়া দিয়া উঠিয়া সেই অজ্ঞাত লোকটার সন্ধানে খানিকটা দূর অগ্রসর হইয়াই বুঝিতে পারিল যে লোকটিকে ধরা সম্ভবপর হইবে না, সে কোথায় কোন্ বনপথে—কোথায় লুকাইল, তার মত অজানা লোকের পক্ষে ঐরূপ ভাবে পিছু ছোটাটাও যে নিরাপদ নহে। সে হাত পা ও পোষাকটি ঝাড়িয়া ঝুড়িয়া লইল এবং দেখিল তাহার হাতের কনুইয়ের কাছে খানিকটা কাটিয়া গিয়াছে।

মনের মধ্যে একটা গ্লানি ও আশঙ্কা লইয়া সে যাদুপুরীতে ফিরিয়া আসিল। দরজাটা বেশ ভাল করিয়া তালা দিয়া বন্ধ করিল। তারপর সে আপনার মনে নানা কল্পনা করিতে করিতে চলিতে লাগিল,—ভাবিল......কে এই লোকটা, যে তার মত একজন কিশোরকে এমন ভাবে আসিয়া আক্রমণ করিল?......না এমন যায়গায় থাকিবার আর কি এমন দরকার, দেশে ফিরিয়া গেলেই বেশ হয়! আবার মনে মনে ভাবিল......না—না সারা ছুটিটা যদি তার এখানে কাটিয়া যায়, তবু সে যেরূপেই হয়......এই ব্যাপারটার একটা অনুসন্ধান না করিয়া ছাড়িবে না।

রজত এ কথাটা কাহাকেও বলিল না। এমন কি মিঃ মাহেন ও এবাড়ীর দাসদাসীকেও কোন কথা বলা আবশ্যক মনে করিল না। সে একাই খাবার ঘরে গেল। প্রচুর সুখাদ্যের আয়োজন করা হইয়াছিল—সে আপন মনে ভাবিতে ভাবিতে খাওয়া শেষ করিল।

রজত কিশোর হইলেও বেশ সবল চিত্তের ছিল। সে মনে মনে ভাবিল, এইত সবে বিপদের সুরু হইল, না জানি পরে আরো কি ঘটে, তবে ইহার মধ্যে তাহাকে প্রাণে মারিবার মত কোন ষড়যন্ত্র আছে বলিয়া মনে হইল না। শুধু ভয় দেখাইয়া তাহাকে এ বাড়ী ছাড়া করিবার মতলব বলিয়াই তাহার মনে হইল। রজত আপনার মনে

হাসিতে লাগিল এবং স্থির করিল, যে করেই হউক লোকটাকে তার খুঁজে বাহির করিতেই হইবে ডিটেক্‌টিবগিরি করিতে হইল শেষটায় না—না—সে শার্লোক হোমস্‌ (Sherlock Homes) না সাজিয়া ছাড়িবে না।

খাবার পর রজত আপনার শোবার ঘরে চলিয়া আসিল। অন্ধকার ঘর হইলেও এখন এঘরের সব তাহার পরিচিত। সে ল্যাম্প জ্বালিল। উজ্জ্বল দীপ্তিতে ঘরখানি আলোকিত হইয়া গেল। এমন সময় সে অদ্ভুত ভৌতিক স্বরে শুনিতে পাইল—সাবধান! সম্মুখে আরও বিপদ!'

রজত আপন মনে বলিল:—যাক্‌গে, এ-সব ভবিষ্যদ্বাণী আর বিশ্বাস করিব না!

তারপর সে তাড়াতাড়ি তার ঘরের দরজাটা খুলিয়া ফেলিল এবং সেখান হইতে সে পাশের ঘরটার দিকে ছুটিয়া আসিল—যদি পাশের ঘর হইতে কেহ ঐরূপ কোন শব্দ করিয়া থাকে! এবং সে ঘরের দরজাতে একটা ধাক্কা দেওয়া মাত্রই দরজাটা খুলিয়া গেল। সে ঘরে ঢুকিয়া দেখিতে পাইল মীরা মেজে বসিয়া কাঁদিতেছে, ঘরের ভিতরটা চন্দ্রের আলোকে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

রজত মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল:—কি হয়েছে মীরা? কাঁদছো কেন?

কোন উত্তর নাই। দু'হাত দিয়া মীরার মুখ ঢাকা। রজতের কথা শুনিয়া সে আরো জোরে কাঁদিতে লাগিল। রজত তাহার আরো নিকটে আসিয়া কহিল:—'দেখনা ভাই লক্ষ্মীটি, এই রাত্তিরে মেজে বসে থাকা ভাল নয়—আমি কি দাসীকে ডেকে দিব?'

না—না—কাকেও ডাকতে হবে না। মীরা বেশ পরিষ্কার কন্ঠে একথা কয়টি বলিল।

তা-হলে বল না ভাই মীরা, কি এমন হয়েছে যে তুমি কাঁদছো?

জানতে হবে না কিছু, যাও, আমি একা থাকতে চাই।

রজত হাসিয়া বলিল:—দেখ বাড়ী এসে তোমার সঙ্গে দেখা করবার সুযোগ পাই নি—এইত সবে খেয়ে এলাম। তুমিত ছিলেনা!

মীরা ঘাড় ফিরাইয়া কহিল: জানি—জানি সব জানি......কেন

পরশু দিনও তুমি ঐ বাঙ্গালী ভদ্রলোক মিঃ গাঙ্গুলির বাড়ী গিয়েছিলে? মীরা আবার কাঁদিতে সুরু করিল।

রজত আশ্চর্য্য হইয়া গেল। মীরা কহিল—মিনার সঙ্গে সন্ধ্যা কাটিয়ে এলেত? কেন—কেন তুমি সেখানে গিয়েছিলে?

বাঃ রে! তুমিত সেদিন ছিলেনা—হঠাৎ সমুদ্রের পাশ দিয়ে যেতে যেতে মিনার বাবার সঙ্গে দেখা হ'ল কিনা! তাই......

আমি সব জানি গো! সব জানি! কেন গেলে, মীরা আবার কাঁদিতে আরম্ভ করিল!

রজত হাসিয়া কহিল: সত্যি আর যাব না, তোমায় একলা ফেলে!

মীরা দাঁড়াইয়া পূর্ব্বেরই মত দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কহিল:......তুমি আর যাবে না? মিনার গান শুনলে কেমন?

রজত বলিল—তোমার মত কি? রাগ করো না ভাই, এবার যাও শোবার ঘরে।

মীরা কহিল: বাঃ রে, আবার ঠাট্টা করা হচ্ছে! তারপর ধীর মন্থর গতিতে তার শোবার ঘরের দিকে চলিয়া গেল।

রজত আশ্চর্য্য হইল, সেই দু'দিন আগে কবে মিনাদের বাড়ী গিয়াছিল, সে খবর কেমন করিয়া মীরা জানিতে পারিল!

মীরা চলিয়া গেলে রজত ভাবিতে লাগিল মীরার কি দুর্জ্জয় অভিমান! যাকগে! কিন্তু ঐ লোকটাই বা কে? আর এই ভৌতিক বাণীই বা আসে কোথা হইতে! মীরাইবা তার নিজের ঘর ছাড়িয়া এখানে আসিল কেন? ঐ ভৌতিক কাহিনীর সহিত কি মীরার কোন যোগ আছে? এসব ভাবিয়া আর কি হইবে......রজত শোবার ঘরে চলিয়া গেল!

রাত্রিতে সে নিরাপদে নিদ্রা গেল। ভৌতিক বাণী রাত্রিতে তাহাকে আর উপদ্রব করিল না।

পরের দিন সকালবেলা সে চা পান করিতে গিয়া দেখিল মীরা আসে নাই। রজত ভাবিয়াছিল দুইজনে একসঙ্গে চায়ের টেবিলে বসিয়া চা পান করিবে কিন্তু মীরাত আসিল না। এমন সময় খাবার দিতে দিতে বৃদ্ধা মাথাং বলিল, মিঃ রজত আপনার বোনের কাল

রাতে ভাল ঘুম হয় নি, তাই তার ঘরে চা দিবার জন্য আমার বোন মনিয়া চলে গেল।

রজত কহিল: উঃ তাকেত কখনও দেখিনি!

সে এদিকে বড় একটা আসে না। মিস্ মীরার ঘরদোর সব দেখে কিনা! তাই ফুরসৎই পায় না!

বেশ! রজত আর একটি কথাও না বলিয়া নীরবে চা পান করিয়া নীচে চলিয়া গেল। তাহার সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধা মাথাংও রান্নাঘরের দিকে যাইতেছিল। রজত সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিতে নামিতে জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, এ বাড়ীতে আমি ও মীরা ছাড়া আর কে কে থাকে জান?"

মাথাং কহিল: তাহার স্বামী, বাগানের মালী ও তার স্ত্রী, সে নিজে আর মনিয়া, নোরা, রহিম ঘোড়ার সহিস, তার বারো বছরের ছেলে আবদুল, আবদুল ছোটখাটো ফাইফরমাস খাটে কখনও গেট খুলেদেয়, ডাকঘরে যায়। এসব আর কি!

এ বাড়ীর যতসব লোকজন আছে সকলেই প্রভুভক্ত কিন্তু এ দেশের লোকেরা এ বাড়ীর মালিককে খুব ভাল চোখে দেখে না। তারা সর্ব্বদা শত্রুতা বাধাতেই চাহে। মাথাং আরো কত কি বলিতেছিল কিন্তু রজত সে দিকে কান না দিয়া চলিল মীরার সন্ধানে।

—চৌদ্দ—

রজতের গোয়েন্দাগিরি

মীরার সন্ধান মিলিল না। রজত দেখিল তাহার ঘর খোলা রহিয়াছে, কিন্তু মীরা বা তাহার দাসী কেহই সেখানে নাই। রজত দুই একবার উচ্চৈস্বরে মীরার নাম ধরিয়া ডাকিল, কিন্তু কোন সাড়া মিলিল না। এইনা শুনিল মীরা অসুস্থ, তবে সে কোথায় গেল!

প্রভাতের প্রসন্ন রৌদ্র চারিদিকে একটা প্রফুল্লতা আনিয়া-দিয়াছিল। রজত আজ সকালে মীরার সঙ্গে সমুদ্র সৈকতে বেড়াইতে আসিবে বলিয়া স্থির করিয়াছিল।

রজত ধীরে ধীরে সমুদ্রের দিকে চলিল। পথটি নির্জ্জন। ডানদিকে সেই ভীষণ জঙ্গল,—যেখানে তার বিপদ ঘটিয়াছিল। সে মনে মনে ভাবিতে লাগিল কে এমন লোক হইতে পারে যে তাহাকে বিনা অপরাধে এমন করিয়া বিপন্ন করিতে পারে।

এমন সময়ে পাহাড়ের পথের বাঁকটা ফিরিতেই সে সম্মুখে দেখিতে পাইল হাস্যময়ী মিনা। সে বিস্মিত হইয়া কহিল: তুমি! কোথায় যাচ্ছিলে বলত?

মীনা সুন্দর নৃত্য ভঙ্গীতে বেণী দোলাইয়া কহিল—আমি ভাই তোমার জন্যই অপেক্ষা করছিলাম। কই মীরা যে এল না! তা'হলে বেশ হ'ত না। মীনা অঙ্গুলি দিয়া দূর পাহাড়ের দিকটা দেখাইয়া কহিল,—চলনা একদিন ও পাহাড়টা বেড়িয়ে আসি!

রজত ও মীনা দুইজনে হাঁটিতে হাঁটিতে অনেকটা দূর চলিয়া আসিল। তারপর রজত কহিল: আঃ কাজটা ভাল হলো না—মীনা, কথা ছিল মীরার সঙ্গে বেড়াতে আসবো, তা মীরাকে যখন পেলুমই না খুঁজে তখন একলাই চলে এলাম, কিন্তু যদি সে এদিকে আসে, তবে বুঝলে ভাই আমার রক্ষা নেই—

মীনা কৌতূহল ভরে তার বড় বড় চোখ দুইটি তুলিয়া কহিল

উঃ ভারীত বীরপুরুষ তুমি! তারপর ঠোঁট ফুলাইয়া, মুখ ঝাঁকাইয়া বলিতে লাগিল—যাই বল না ভাই, বলতে নেই, তোমার ঐ বোন মীরা বড় ছিঁচকাঁদুনে! যেন কচি খুকি! কথায় কথায় রাগ! কথায় কথায় অভিমান! বলত এ কেমন ধারা!

রজত ঐ ছোট মেয়েটির কথা বলার ভঙ্গী দেখিয়ে হাসিয়া ফেলিল।

তুমি হাস আর যাই করো—আমি সত্যি কথা বলি। হাঁ ভাই আজ আসবে সন্ধ্যেবেলা আমাদের ওখানে? গল্প শুনবে। বাবা বলবেন! জান আমার বাবা, খুব বড় বড় বই লেখেন কিনা!

রজত কহিল, না আর যাবনা তোমাদের ওখানে। বিকেলে আমি আর মীরা একসঙ্গে বেড়াবো ভাবছি!

মীনা চুপ করিয়া রহিল। সহসা তার বাবা মিঃ গাঙ্গুলিকে দেখিয়া সে উৎফুল্ল হইয়া কহিল,—আমি যাই ভাই বাবা আসছেন। রজত দেখিল চোখে চশমা পরা দীর্ঘকায় এক সৌম্য মূর্ত্তি প্রৌঢ় তাহাদের দিকে আসিতেছে।

এই মীনার সঙ্গে সেদিন তাহার বাড়ী ফিরিবার পথে পরিচয় হইয়াছিল। রজত বরাবরই খুব উৎসাহী ও কৌতূহলি প্রকৃতির ছেলে, সে সেদিন সমুদ্রের দিক হইতে যে পাহাড়ের পথটা উত্তর দিকে চলিয়া গিয়াছে, সে পথটার কোথায় শেষ তাহার সন্ধানে যাইতে যাইতে মীনার সহিত তাহার সম্পূর্ণ আকস্মিকভাবে দেখা হইয়া গেল। পাহাড়ের ঢালু গায়ে একটি সুন্দর বাঙ্গলোর বারান্দায় বসিয়া মীনা খেলা করিতেছিল, সে রজতকে দেখিতে পাইয়া গেটের নিকট আসিয়া কহিল—হাঁ ভাই তুমি কি বাঙ্গালী? রজত হাসিয়া কহিল—হাঁ। তবে ভিতরে এস না! —মীনা রজতকে একরূপ হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া তাহার মায়ের কাছে লইয়া গিয়া কহিল—মা, তুমি বলেছিলে এখানে আর বাঙ্গালী নেই, দেখ দেখি কেমন এক বাঙ্গালী ছেলেকে ধরে এনেছি।

মীনার মা রজতের কাছ হইতে একে একে সব কথা জানিয়া লইলেন। সেদিন সন্ধ্যায় মীনার সঙ্গে পড়াশুনা, ব্রহ্মদেশের কথা অনেক হইল। মীনার বাবা রেঙ্গুনের একজন অ্যাডভোকেট, প্রতি বৎসর থিয়াটুতে দু'মাস আসিয়া থাকেন। এবং এখানকার বাড়ীটি

তাঁহার নিজের। মিঃ গাঙ্গুলির নাম হইতেছে বিভূতি গাঙ্গুলি। লোকটি পুরাপুরি সাহেবী ভাবাপন্ন। সেদিন রজতের সঙ্গে তাঁহার দেখা হয় নাই।

মীনার মা রজতকে মিষ্টিমুখ করাইয়া নিজের চাকর দিয়া যাদুপুরীতে পৌছাইয়া দিয়াছিলেন। মীনার সঙ্গে মীরার পরিচয় হইয়াছিল একমাস আগে। বাঙ্গালী মেয়ে দু'টি একসঙ্গে খেলাধূলা করিত। পরের দিন মীনা একবার যাদুপুরীতে মীরার কাছে আসিয়াছিল, সেই সূত্রে রজতের সঙ্গে তাহার কি ভাবে প্রথম পরিচয় ও আলাপ হইয়াছিল, সে কথাও বলিয়াছিল।

মীনা চলিয়া গেলে রজত খানিকক্ষণ পর্য্যন্ত সমুদ্রের তীরে নীরবে বসিয়া রহিল। তাহার মনে হইল ঐ যে ভৌতিক বাণী, তাহা হয় মীরা কিংবা অপর কোন বাড়ীর লোকের কাজ, যাহাতে সে ভয় পাইয়া এখান হইতে চলিয়া যায়। আবার মনে হইল, তাহার সাহস কেমন সে নির্ভীক কিনা তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য হয়ত দাদুভাই এমন কোন কৌশল করিয়াছেন যাহা সে এখনও আবিষ্কার করিতে পারে নাই। যে করিয়াই হউক এ গুপ্তরহস্য বাহির করিতেই হইবে। এইরূপ দৃঢ়পণ করিয়া রজত বাড়ী ফিরিল।

রজত প্রথমেই মীরার সন্ধানে গেল। এইবার সে মীরাকে তাহার ঘরের মধ্যে একখানা আরামকেদারায় একটা বিড়াল কোলে করিয়া বসিয়া আছে দেখিতে পাইল। কি কুৎসিত বিড়াল সেটা। কত রং বেরঙ তার গা। রজত কোন দিনই বিড়াল পছন্দ করিত না। রজত মীরাকে কহিল—কেমন আছ মীরা?

তবু যা হোক আমার কথা তোমার মনে পড়েছে। রজত বলিল বেশ, আমি তোমাকে সকালের দিকে খুঁজতে এসেত পেলাম না— তারপর কি আর করি একাই বেড়াতে গিয়েছিলেম।

শুনে সুখী হলাম। মীনার সঙ্গে দেখা হয়েছেত?

নিশ্চয়! রজত হাসিল। তারপর গম্ভীর ভাবে কহিল—মীরা আমি তোমাকে কয়েকটা কথা জিজ্ঞাসা করতে এসেছি।

মীরা চেয়ার হইতে উঠিয়া দাঁড়াইল। সেই বিড়ালটা তাহার কোল হইতে লাফাইয়া পড়িয়া ল্যাজ উঁচু করিয়া মেও মেও শব্দ করিতে করিতে বাহিরে চলিয়া গেল।

মীরা কহিল—কি প্রশ্ন তোমার বল।

রজত বলিল—বসো। তারপর মীরার পাশে বসিয়া কহিল—

আচ্ছা মীরা তুমি বলতে পারো, এ বাড়ীটাকে যাদুপুরী বলে কেন? বাড়ীর চারিদিকে এত উঁচু প্রাচীরই বা কেন, আর দিনরাত তালা বন্ধই থাকে কেন? আমি দু-একজনকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তাঁরা বলে যে এ-বাড়ীতে দাদুভাই কি সব যাদুমন্ত্র পড়েন, কি যে করেন কেও জানেন না, নানা জনে নানা কথা বলে, সেদিন একজন কে'ন বলছিলেন যে দাদুর নাকি অনেক টাকা। তিনি সেইসব টাকাকড়ি সোনা—মোহর এ বাড়ীর একটা গুপ্ত কক্ষে লুকিয়ে রেখেছেন, এজন্য চারিদিক দিয়ে এত কড়াকড় পাহারা।

মীরা কহিল—অসম্ভব নাও হতে পারে।

কিন্তু—কেমন যেন একটা ভৌতিক ব্যাপারও আছে, তুমি কি তার কিছু জান।

মীরা অন্যমনস্কভাবে কহিল—যদিও বা কিছু জানি, তাত বলতে পারব না, সে যে দাদামশাইয়ের মানা।

বটে! বলত কেন?

বিড়ালটা মেঁও মেঁও করিতে করিতে আবার ঘরে ঢুকিতেই মীরা আবার সেটাকে কোলে তুলিয়া লইয়া আদর করিতে করিতে বলিল, তা আমি বলতে পারি না। তবে আমার মনে হয় দাদা-মশাইয়ের ইচ্ছে—এই রকম, যার বুদ্ধি বা সাহস আছে, সেত খুঁজেই বার করতে পারবে। এসব কথা আবার তোমায় বলা ঠিক হচ্ছে না রজতদা!

—বেশ। বুঝতে পেরেছি এজন্যই তুমি ভূত সেজে আমায় ভয় দেখাও, আমি যেন দেশে ফিরে যাই, এইত!

মীরা—উচ্চৈস্বরে কহিল—না গো না। মিথ্যে কথা—আমি তোমাকে এখানে থাকতে দিতে চাই না, একি সম্ভব! আমি চাই তুমি এখানেই থাক। সত্যি কথা। আমি এসব কিছু জানি না।

তবে কে আমাকে এখান থেকে তাড়াবার জন্য এমন কাজ করে?

জানিনা ভাই রজতদা!

আচ্ছা, মীরা, দরজার গায়ে ঐ কাঠের বাক্সটাকে রেখেছে জান?

মাহেন গো মাহেন। নিজে ঐ যন্ত্রটা তৈরী করে ওখানটায় রেখে

দিয়েছে। দাদামশাই এক অদ্ভুত ধরণের লোক, তিনি কি বলেন জান?

কি?

দাদু বলেন—যদি আমরা মানুষেরা এ বাড়ীতে বাস করতে পারি। তবে দু'দশটা ভূতও থাকবে না কেন?

রজতের মনে পড়িল, একদিন তার মা বলেছিলেন! জানিস রজত, তোর দাদু বড় খামখেয়ালী মানুষ, নানা রকম অদ্ভুত খেয়াল নিয়ে তাঁর অবসর সময়টা কাটাইতে চান। বোধহয় এটা ও সে রকমই একটা খেয়াল মাত্র!

বেশ, তবে এ বাড়ীর নাম 'যাদুপুরী' দিলেন কেন জান?

এখানকার ছেলেমেয়েরা মই দিয়ে দেয়াল ডিঙ্গিয়ে বাগানের ফল পাড়বার জন্য যেমন প্রাচীরের উপর উঠেছিল অমনি তারা সব ছিটকে মাটীতে পড়ে গিয়েছিল, বোধহয় গ্রামের ছেলেমেয়েরাই এ বাড়ীর নাম 'যাদুপুরী' দিয়ে থাকবে!

বলত সেই দেয়ালটা কোন দিকের?

না, সে আমি বলতে পারবো না।

আচ্ছা, যদি কোন ভয়ের কারণ না থাকে, তবে আমি নিজেই খুঁজে বার করবো, কেন এমন শব্দ হয়? সব বের করে ফেলবো, দেখবে এ আমি করবোই। মীরা রজতের দিকে তাহার দুইটি উজ্জ্বল চক্ষু তুলিয়া বিদ্রূপের স্বরে কহিল—সে খুব ভাল হবে! কোন ভয় নেই তোমার—দাদামশাইত আর ডাকাত বা দস্যু নন, যে কাকেও খুন করবেন।

রজত এইবার চেয়ার হইতে উঠিয়া কহিল, বেশ কথা, বল না মীরা, আমাকে বাড়ীটার সব ঘর জিনিষপত্র, বাগান সব ভাল করে দেখিয়ে আনবে।

—মীরা তাহার কোল হইতে বিড়ালটাকে মাটীতে ফেলিয়া দিয়া কহিল: বেশ, তবে কোন্ দিক থেকে আরম্ভ করতে চাও বলত?

রজত কহিল—আমি রান্নাঘর, নীচতলার সব ঘরগুলি, লাইব্রেরী খাবার ঘর, ভাঁড়ার, বসবার ঘর সব দেখেছি। বসবার ঘরে কি ভয়ানক ধুলো জমে আছে!

তবে চল উপরতলা হ'তে আরম্ভ করা যাক্।

তাহারা দুইজনে দ্বিতলের ঘরগুলি দেখিতে দেখিতে সিঁড়ি বাহিয়া উপরে চলিয়া গেল। একটির পর একটি ঘর দেখিতে দেখিতে অবশেষে রজত জিজ্ঞাসা করিল—মীরা, দাদামশাই কোন্ কোন্ ঘরে থাকেন? উপরের ঘরগুলির মধ্য দিয়া যে পথটি শেষ দিকে চলিয়া গিয়াছে, তাহার শেষ দিকের দুইটি ঘর দেখাইয়া মীরা কহিল—দাদু এই ঘর দুইটিতে থাকেন। এখন ঘরগুলি তালা বন্ধ। তাঁর অনুপস্থিতিতে খোলার অধিকার কারু নেই।

তুমি কি এ ঘরের ভিতর কোন দিন গিয়েছ?

কখনো—কখনো গিয়েছি বৈ কি।

আমি মাথাংএর কাছ থেকে চাবি নিয়ে আসছি। রজত নীচে চলিয়া গেল। মীরার কাছে ব্যাপারটা ভাল লাগিতেছিল না। সে বারান্দার একপাশে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, রজতের সঙ্গে নীচে নামিয়া গেল না।

রজত মাথাংএর কাছে ঘরের চাবি চাহিতেই মাথাং বিরক্তির সহিত কহিল—সে হতে পারে না—মাষ্টার রজত।

কেন?

সে আমি জানি না। তাঁর হুকুম। মীরা দিদিকে পর্য্যন্ত তাঁর ঘরের চাবি দিতে মানা করে গেছেন।

আমাকেও তিনি মানা করেছিলেন?

হাঁ, আপনাকেও।

রজত একটি কথাও বলিল না, সামান্য ক্রোধও প্রকাশ করিল না। সে বাগানের পাশে গিয়া মীরাকে ডাকিল। সে আর উপরে গেল না। মীরা নীচে নামিয়া আসিলে মৃদু কন্ঠে কহিল—চলো, বাগানটা বেড়িয়ে আসি। কি সুন্দর সব ফুল ফুটেছে। চমৎকার।

রজত ও মীরা দুইজনে বাগানের দিকে চলিয়া গেল। মাথাং কঠোর দৃষ্টিতে তাহাদের দিকে চাহিয়া রহিল।

— পনেরো —

নমস্কার শার্লোক হোমস মশাই

রজত মীরা—দুইজনে বাগানের সুন্দর পথ ধরিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে দেখিতে পাইল—বাগানের সাজ-সজ্জা, নানা জাতীয় ফুল, নানা দেশের অর্কিড, বাগানটিকে করিয়াছে যেন একটি স্বপ্ন কানন। কত জাতীয় ফুল যে ফুটিয়াছে, কত নধর লতিকা যে তরুতে তরুতে জড়াইয়া উঠিয়াছে তাহা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। সুন্দর প্রশস্ত পথ—বাগানের চারিপাশ দিয়া ঘিরিয়া চলিয়াছে। বড় বড় গাছের পাতায় ঢাকা ডালে বসিয়া সুকন্ঠ পাখীরা সব গান করিতেছে।

মীরা কহিল,—কেমন লাগছে ভাই রজতদা?

রজত মীরার কাঁধে একখানি হাত রাখিয়া কহিল—সত্যি ভাই, এ বাগান দেখে মনে হয়, এখানেই থেকে যাই। গোলাপ ফুলের মিষ্টি গন্ধ চারিদিক সুরভিত করে তুলেছে! কি চমৎকার বড় বড় সব গোলাপ! আচ্ছা, এইবার বাড়ীটার পথ ঘাট আমায় ভাল করে বুঝিয়ে দাও না। বাড়ীর শেষ সীমাটা কোথায়? —ওই যে অতি দূরে দেবদারু গাছগুলি সার বেঁধে রয়েছে সেখানে কি?

মীরা কহিল: না গো মশাই না। —গাছগুলির পেছনটা দিয়ে খানিকটা এগুলে পর দেখতে পাবে ছোট একটি পাহাড়। সে পাহাড় হচ্ছে এ-বাড়ীর-এ-বাগানের একটা সীমা!

উঃ তবেত এ সোজা ব্যাপার নয়! —বুঝতে পারলুম না—দাদামশাইয়ের মত একা একজন মানুষের পক্ষে এত বড় বাড়ীর কি প্রয়োজন ছিল?

সে আমি কি করে বলবো বলো। —তিনি এলে তাঁকে জিজ্ঞেস করে দেখো।

দূরে একজন মালী—পরম যত্নসহকারে গোলাপ গাছগুলির গোড়া খুঁড়িয়া দিতেছিল, আর একটি মালী—গাছের তলায় নিশ্চিন্ত-ভাবে পরম আরামে বসিয়াছিল। —মালী দুই জনেই তাহাদের দিকে একবার চাহিয়া আবার কাজে মন দিল।

রজত ও মীরা দুইজনে আর খানিকটা পথ চলিতেই দেখিতে পাইল এমন সুন্দর বাগানের শোভা হ্রাস করিয়া একটি টিনের ছাউনি। গুদাম ঘরের মত ঘর। এমন সুন্দর বাগানের মাঝখানে ঐ রকম একটা বিশ্রী ধরণের বাড়ী একেবারেই মানানসই ছিল না। রজত মনে মনে ভাবিতেছিল, দাদুভাইয়ের মত একজন সুরুচিসম্পন্ন লোকের পক্ষে এমন ধরণের একটা গুদোম ঘর তৈরী করা যে কি অন্যায়



মালী বাগানে জল দিতেছে

-তাহা ভাবিয়া সে দুঃখিত হইল—তাহার মনে একটু রাগও হইল।

রজত কহিল,—মীরা, তোমার কি মনে হয় এ বিশ্রী গুদোম ঘরটা দাদুভাই তৈরী করেছেন?

মীরা সংক্ষেপে উত্তর করিল;—তাইত মনে হয়। একথা বলিতে বলিতে সে লতানো গোলাপ গাছটা হইতে একটি অতি সুন্দর গোলাপ ফুল তুলিয়া লইয়া তাহার কোমল অঙ্গুলি দিয়া ফুলের পাপড়ি কয়টি নাড়াচাড়া করিতে লাগিল।

রজত ধীরে ধীরে ঘরটির কাছে আসিল। সেই ঘরের কোন দরজা বা জানালা ছিল না। রজত ঘরটার চারিদিক প্রদক্ষিণ করিয়া দেখিল, তারপর মীরাকে কহিল:—এমন ঘর তৈরী করার মানে কি? হঠাৎ তাহার নজরে পড়িল পাশের ঝোপের কাছে একটা মই পড়িয়া আছে। রজত সেই মইটি ঘরের ছাতের সঙ্গে লাগাইয়া তাহার উপরে উঠিল। মীরা ভয়ার্ত্ত কন্ঠে কহিল, ওকি হচ্ছে রজতদা? সাবধান!

রজত মীরার দিকে একবার চাহিল কিন্তু কোন কথা বলিল না। কিছুক্ষণের জন্য উভয়েই নীরব রহিল। শুধু সবুজ সুন্দর লতাকুঞ্জে বসিয়া পাখীরা গান করিতেছিল। ফড়িংয়ের দল নানা-বর্ণে সুরঞ্জিত পাখনা উড়াইয়া উড়িতেছিল। রজত হাতের পাশ দিয়া যে মাধবীলতাটা উপরে উঠিয়াছিল তাহার একটা পাতা মীরাকে লক্ষ্য করিয়া ছুঁড়িয়া মারিল। মীরার গালের উপর আসিয়া পড়িলে মীরা হাসিয়া উঠিল। যে মীরা একদিন রজতের কাছে ছিল অপ্রিয়, সেই মীরা ও রজত দুইজনে এখন পরষ্পরের ক্রীড়াসঙ্গী হইয়া উঠিল। দুই ভাই বোনের প্রীতি ও স্নেহ এই দূর দেশে যেন নূতন ভাবে উভয়ের স্নেহ-বন্ধনকে দৃঢ়তর করিল।

মীরা রজতকে বিভ্রান্ত দেখিয়া কহিল: কেমন জব্দ? এইবার পথের সন্ধান কি পেলে? —একথা বলিতে বলিতে মীরাও মইটার কয়েকটি ধাপ বাহিয়া রজতের কাছাকাছি আসিয়া বলিল: আমি জানি কি ভাবে এ ঘরের ভিতর ঢুকতে হয়।

তবে দুষ্টুমি করলে কেন এতক্ষণ?

নেমে এস আমি যতটা জানি বলবো।

উভয়ে নামিয়া আসিয়া একটা বড় 'াছের পাশে ছায়ার মধ্যে যে

একটা মস্ত বড় শিলা পড়িয়াছিল, তাহাতে বসিলে পর মীরা বলিতে লাগিল:—আমি দাদুভাইকে অনেকবার এ-ঘরের কথা আর কি করে ওর ভিতর ঢুকতে হয় সে কথা জিজ্ঞেস করেছি, কিন্তু তিনি কিছুতেই আমার কথার জবাব দেন নি। কি জানি কি কৌশলে এ ঘরটা তৈয়ারী। বড় মালীর কাছে চাবি আছে। আর ঐ টীনের দেয়ালে কি জানি কোথায় একটি লুকানো গুপ্ত দরজা আছে। বড় মালী আমায় বলেছে যে প্রতি বৎসর শীতকালে যখন রেঙ্গুনে পুষ্প প্রদর্শনী হয়, তখন তিনি শুধু একবার মালীর কাছ থেকে চাবীটা চেয়ে নেন্।

তবে কথাটা বেশ বোঝা যাচ্ছে যে নিজে ও ঘরের ভিতর ঢুকতে পারেন না।

মীরা হাসিয়া বলিল—যে ঘরের ঢুকবার কোন দরজাই নেই, সেখানে ঢুকবেন কেমন করে?

দাদুভাই তবে চাবি চেয়ে নিতেন কেন? জান মীরা—আমরা যে করে হয় ও ঘরের মধ্যে ঢুকতে চেষ্টা করবো। আমার ভয়ানক কৌতূহল হচ্ছে, যে করে হউক ও ঘরের ভিতর যাব।

মীরা হাসিয়া বলিল:—দাদুভাই আমাকেত কিছু বলেন নি, তবে আমি যে টুকু ভাই শুনেছি তাই বললুম। আমার মনে হয় মিঃ মাহেন এ-রহস্য জানেন, তবে আমিত ঠিক করে বলতে পারবো না। আমি যখনই তাঁকে জিজ্ঞেস করেছি, তখনই তিনি হেসে উড়িয়ে দিয়েছেন। এ বাড়ীর অন্য লোকজন কেহ এ ঘরের কোনও খবর রাখে বলেও মনে হয় না।

রজত তাহার মাথার চুল দুই হাত দিয়া টানিতে টানিতে বিস্ময়ের সহিত ঘরটার দিকে চাহিয়া রহিল। এবং কিছুকাল পরে হঠাৎ উচ্চৈঃস্বরে কহিল:—মীরা! আমি এ-ঘরের রহস্য বুঝতে পেরেছি।

মীরা আনন্দে লাফাইয়া উঠিল এবং ব্যগ্রকন্ঠে বলিল,—কোথায় কি দেখলে বলত?

আমার মনে হয় এ ঘরটার ভিতরে যাবার কোন একটা সুরঙ্গ পথ আছে। তা' ছাড়া এ ঘরে ঢুকবে কি করে? নিশ্চয়ই এ ঘরে যাবার ঐ ধরণের কোনও গুপ্ত পথ রয়েছে। তুমি কিছু জান মীরা?

সত্যি আমি ভাই কিছ্বই জানিনে—হাঁ তবে আমার মনে হয় যে ও ধরণের কোন একটা পথ হয়ত বা থাকতে পারে। তোমারও দেখছি ঐ রকমই একটা কথা মনে হচ্ছে। এসনা দ্ব'জনে খ্বঁজে দেখি যদি বের করতে পারি। বারে বা—তবে কি মজাই না হবে। দাদ্বভাই বলেছেন এ বাড়ীটা তাঁর কিনবার আগে বর্মী ডাকাতদের একটা আড্ডা বাড়ী ছিল। চারিদিকে ছিল গভীর জঙ্গল। থিয়াট্বর একজন রাজার ছিল এ বাড়ীটা, তাঁর বংশের কেউ ছিল না বেঁচে, এ বাড়ী, বাগান সব ভীষণ জঙ্গলা হয়ে পড়েছিল। বাঘ, ভাল্বক, সাপের ছিল আড্ডা। বর্মী ডাকাতেরা নির্ভয়ে বাস করতো এখানে। ইংরাজ যখন এ-দেশের রাজা হলেন, তখন এ-সহর আবার ন্বতন করে গড়ে উঠলো। দাদ্বভাই—সরকারের কাছ থেকে নাম মাত্র দামে এ বাড়ীটা নিলেন কিনে, তারপর ভেঙ্গে গড়ে ন্বতন করে এ বাড়ী বাগান সব তৈরী করেছেন।

রজত ধীর ভাবে মীরাকে কহিল, মীরা, তুমি এত খবর জান তাত জানতুম না? আমি যে রকম দেখছি মাসের পর মাস না খ্বঁজলে কোন সন্ধানই যে মিলবে না। আমিত সবে কয়েকদিন হ'ল এসেছি। এস, আমরা চেষ্টা করে দেখি—কোন্ দিক কোথায় হতে পারে গ্বপ্তপথ! না—না—আমায় খ্বঁজে বার করতেই হবে। জান মীরা, আমি শার্লোক হোমসে পড়েছি যে যত কিছ্ব গোপন ব্যাপার, সবই হয় লাইব্রেরী ঘর থেকে। ভাবছি একবার লাইব্রেরী ঘরটা থেকে—

মীরা রজতের কথা শ্বনিয়া হি-হি-হি করিয়া হাসিতে লাগিল।

আমিত ভাই কোন হাসির কথা বলিনি—তবে যে তুমি হাসছো—মীরা তাহার বেণী দোলাইয়া বলিল:—না হেসে থাকতে পারল্বম না। —হাঁ ভাই, সত্যি বলছি কেন যে পারল্বম না তা তোমায় বলতেই পারবোনা—কেন যে পারবো না, তাওত জানি না—আবার মীরা হাসিতে লাগিল।

রজত গম্ভীর ভাবে বলিল:—দেখ, আমি খ্বব রেগে যাচ্ছি। আমি চাইছি কিনা শার্লোকহোমসের মত গ্বপ্ত পথের সন্ধান করতে আর তুমি কিনা হাসছো। ডিটেকটিভগিরি বড় সোজা কথা কিনা! অনেক ভেবে চিন্তে কাজে এগ্বতে হয়। ধরনা কেন—দাদ্বভাই কেন

শুধু একদিনের জন্য বড় মালী মনিয়ার কাছ থেকে চাবি চেয়ে নিতেন—আর কোন দিন নয় কেন? এ-বিশ্রী ঘরটার ভিতর তাঁর সেদিন যাওয়ার কি আবশ্যক হতে পারে? যদি এই গোপন রহস্যটুকু বের করতে পারি তবে—সব কিছুই জানতে পারবো। আমিত তোমায় একথা বেশ ভাল ভাবেই বুঝিয়ে বলছি।

রজতদা! তাহলে তুমিত অতি ভয়ংকর মানুষ—তুমি কিনা গোয়েন্দা? হাঁ ভাই শার্লোক হোমস্ দাদা—আমার পেছনে কিন্তু আবার গোয়েন্দাগিরি করো না, বলে রাখছি! আমি নেহাৎ ভাল মানুষ। —আমি অবশ্য সামান্য রকমের কিছু কিছু জানি,—সে আর আমি বলছি না, তুমিত নিজেই খুঁজে বার করবার ভার নিয়েছ।

রজত বিদ্রূপের সুরে বলিল:—বেশ! তবু যে আপনি দয়া করে একথা কয়টি বললেন! আচ্ছা, মনে রেখো! দেখা যাবে আমি এ-বাড়ীর গুপ্ত রহস্য ভেদ করতে পারি কি না। জান! আমি কিছুতেই ভয় পাবার ছেলে নই!

এমন সময়—মনিয়া আসিয়া কহিল—দাদাবাবু, দিদিমণি আপনাদের বাইরে কে একজন লোক ডাকছেন।

বেলা যে কখন পড়িয়া গিয়াছিল, তখন তাঁহারা দুইজনে কেহই লক্ষ্য করে নাই। রজত দেখিল—সূর্য্য পশ্চিম দিকে অনেকটা ঢলিয়া পড়িয়াছেন। চারিদিকে বেশ একটা শান্তশ্রী জাগিয়া উঠিয়াছে। সে মীরাকে কহিল: বোধহয় মিঃ মাহেন এসেছেন। চলো সমুদ্রের ধারে বেড়িয়ে আসা যাবে। —বাগানের চাবিটি বড় মালীর হাতে দিয়া উভয়ে বাগানের বাহিরে যাদুপুরীর দরজার কাছে আসিয়া দেখিল—মিঃ মাহেন, তার একটি বোন্ আর মিনা ও তাহাদের বাড়ীর একটি ভৃত্য তাহাদের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে।

মীরা ও রজত উভয়ে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। এতক্ষণ তাহারা যেন এক কুহেলি জগতে বাস করিতেছিল। এইবার যেন মুক্ত পৃথিবীর মাঝখানে আসিয়া পড়িল।

সকলে বাহির হইয়া পড়িল সমুদ্রের দিকে। সমুদ্রের তীরের পথটিতে আজ লোকজন বড় বেশী চলাচল করিতেছিল না। আকাশের ঈশান কোণে কাজল কালো মেঘ আসন্ন বর্ষণের উৎকন্ঠা জাগাইয়া ধীরে ধীরে—সারাটা আকাশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। দূর

সমুদ্রের বুক দিয়া একটা জাহাজ যাইতেছিল, তাহার ধূসর ধোঁয়া কালো মেঘের সহিত মিশিবার জন্যই যেন ঊর্দ্ধদিকে উঠিতেছিল।

মিঃ মাহেন বলিলেন:—কি ভীষণ মেঘ করেছে। নাঃ আর বেশীক্ষণ বাইরে থাকা চলে না। বৃষ্টি এলো বলে—সকলকেই ভিজতে হবে। দিনটি ভাল থাকলে আজ আনন্দের সঙ্গে অনেকটা পথ বেড়াতে পারতুম। —কি বলেন—মাষ্টার রজত। চলুন বাড়ী ফিরে যাই!

—রজত বিনা দ্বিধায় সম্মতি জানাইল। সমুদ্রের কালো বিক্ষুব্ধ ঢেউয়ের বুক দিয়া যে জাহাজখানি পাড়ি দিয়া চলিয়াছে, সেকি তাহারই মত—তাহার চারিদিক ঘিরিয়া যে ষড়যন্ত্র যে বাধা বিঘ্নের সৃষ্টি হইতেছে তাহার কি রহস্য ভেদ করিতে পারিবে না?

মিঃ মাহেন তাহার ভগ্নীকে লইয়া দ্রুতবেগে তাহাদের বাড়ীর দিকে চলিয়া গেল। যাইবার সময় মিঃ মাহেন রজতের দিকে একবার তীক্ষ্ন অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া মৃদু হাস্য করিয়া চলিয়া গেল।

ঝড় বহিতে আরম্ভ করিয়াছে। তুমুল বৃষ্টির ধারা ঝর্ ঝর্ ঝম্ ঝম্ রবে পড়িতে লাগিল। মীনা ও তাহার সঙ্গী ভৃত্যটি পূর্বেই বাড়ী চলিয়া গিয়াছিল। —রজত ও মীরা ভিজিতে ভিজিতে যখন যাদুপুরীতে ফিরিয়া আসিল—তখন মেঘাচ্ছন্ন আকাশের অন্ধকার ও সন্ধ্যার অন্ধকার মিলিয়া এক নিবিড় গাঢ়তম অন্ধকারের সৃষ্টি করিয়াছিল।

মীরা হাসিতে হাসিতে বলিল,—রজতদা, দেখেছ, কেমন ভিজে গেছি। চায়ের টেবিলে বসে কথা হবে—তুমিওত কম ভেজনি? যাও কাপড় ছেড়ে এস। মীরা তাহার ঘরের দিকে চলিয়া গেল। রজত চিন্তিত মনে তাহার ঘরে আসিল। দেখিল মাথাং বেশ পরিপাটিরূপে তাহার ঘর সাজাইয়া গিয়াছে। সে কাপড় ছাড়িয়া সাজিয়া গুজিয়া খাবার ঘরের দিকে যাইতেছে এমন সময় সে শুনিতে পাইল—কে যেন বলিতেছে—

'নমস্কার শার্লোক হোমস্ মশাই—সাবধান।' রজত হাসিল। সে নির্ভীক মনে ঘট্ ঘট্ করিয়া সিঁড়ি বাহিয়া নীচে নামিয়া আসিয়া দেখিল মীরা তাহার আগেই খাবার টেবিলের কাছে আসিয়া তাহার অপেক্ষায় বসিয়া আছে।

—ষোলো—

আহা! বেচারা মালী!

রজত খাবার টেবিলে আসিয়া বসিলে পর মীরা হাস্যমুখে কহিল, এখন খাবার পর কি করবে তুমি, জিগ্‌গেস্‌ করি?

রজত বলিল, আমাকেত প্রশ্ন করা হলো তুমি কি করবে বলত?

সে কথার আগে শোন আমার উপদেশ, এখন দিব্যি খেয়ে দেয়ে আরাম করে শুয়ে পড়। ঘুমুলে পর মাথা ঠান্ডা হয়ে যাবে!

রজত স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল: সত্যি ভাই মীরা, কাল রাত্তিরে মোটেই আমার ভাল ঘুম হয়নি, বাবা, মাকে বোনদের সব স্বপ্ন দেখেছি—আর মাঝে মাঝে শুনেছি কে যেন আমার নাম ধরে ডাকছে! কি অদ্ভুত বাড়ী বলত!

খন্ড কালো মেঘের মত একরাশ কালো কোঁকড়ান চুল, মীরার সুন্দর মুখখানার উপর আসিয়া পড়িয়াছিল। সে তাহার বাঁ হাত দিয়া চুলের গোছা সরাইয়া মৃদু হাস্য করিয়া বলিল, যাই বলনা কেন ভাই রজতদা, আমাকে ফেলে একাই যেন এ বাড়ীর একটা কিছু গুপ্ত-রহস্য আবিষ্কার করে ফেলনা। বুঝেছ—লক্ষ্মীটি!

আচ্ছা মীরা, তুমি কি এ বাড়ীতে বেশ নিশ্চিন্ত মনে ঘুমুতে পার?

মীরা সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল,—সময় সময় ভাল ঘুমুতে পারি না বটে, তবে বেশীর ভাগ রাত্রিই খুব-খুবই ঘুমুই, আচ্ছা একথা কেন? তা যাই হোক ভাই, আমাকে লুকিয়ে না জানিয়ে শার্লোক হোমস্‌ গিরি করো না, তা হলে কখ্‌খনো ভাল হবে না!

আমিত কখনো বলিনি যে তোমাকে লুকিয়ে গোয়েন্দাগিরি

করবো! তবে শুনে রাখ যে করেই হ'ক ঐ ঘরটার ভেতর ঢুকবার গুপ্ত পথটা আবিষ্কার করবোই করবো।

এমন সময় টেবিলের তলা হইতে মীরার বিড়াল বোলন্ হঠাৎ মিউ মিউ করিতে লাগিল।

রজত কথার প্রসঙ্গটা ফিরাইয়া নিল। সে কহিল,—আচ্ছা তুমিত আমার অনেক আগে এসেছ, বর্মন ভাষাটা কিছু শিখে ফেলেছ কি?

না ভাই! দু'চারিটা কথা শিখেছি মাত্র। তবে শুনতে বেশ ভাল লাগে। শব্দের মধ্যে একটা বেশ সুরের রেশ আছে। তবে কি জান ভাই আমাদের বাংলা ভাষার মত মধুর একেবারেই নয়!

রজত জানালার ভিতর দিয়া দেখিতে পাইল, তখনও আকাশ পুঞ্জীভূত কালো মেঘে ঢাকিয়া রহিয়াছে, অবিশ্রান্ত ভাবে বৃষ্টি পড়িতেছে। অদূরে পাহাড়ের গা হইতে ঝম্ ঝম্ শব্দ করিতে করিতে বৃষ্টির জল নীচে নামিয়া আসিতেছে।

রজত ও মীরার খাওয়া হইয়া গিয়াছিল। মীরা তাহার প্রিয় বোলনকে কোলে করিয়া নিজের ঘরের দিকে চলিয়া গেল।

মীরা চলিয়া গেলে পর রজত তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে একবার রান্নাঘরের দিকে চাহিল। আজ সকাল বেলা সে যখন ঐ ঘরের পেছনের দরজার মধ্য দিয়া বাহিরে গিয়াছিল, সে সময়ে তাহার কি জানি কেন একটা কৌতূহল জাগিয়া ছিল, তাহার মনে হইতেছিল মাটির নীচের সুরঙ্গ পথ সন্ধানের পূর্ব্বে একবার ঐ ঘরের দিকটা ভাল করিয়া পরীক্ষা করা উচিত। হয়ত ওখানকার কোন দিকে কোন গুপ্তপথ থাকিতে পারে! এই রকম মনে ভাবিয়া সে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলে দেখিতে পাইল—সমুদয় কাজ কর্ম্ম শেষ করিয়া দাসদাসীরা খাবার আয়োজন করিতেছিল। রজত তাহাদের দিকে লক্ষ্য করিতেই মাথাং কহিল:—এখনও বৃষ্টি হচ্ছে মাষ্টার রজত!

—রজত কহিল, হাঁ, তাত দেখতেই পাচ্ছি। আমি এই রাত্রিতে বেশী দূরে কোথাও আর যাচ্ছি না, খিড়কীর দোরটায় ওদিকটায় একটু যাবো।

রজত ভিতরকার দিকের দরজাটা বন্ধ করিয়া ফেলিয়া

মাঝখানকার পথটা দিয়া চলিবার সময় লক্ষ্য করিয়া দেখিল যে রান্না-ঘরের পেছনের দরজাটার গায়ে শক্ত মজবুত একটা তালা দিবার ব্যবস্থা রহিয়াছে। সেখানে দেয়ালের গায়ে লোকজন ডাকবার জন্য কোন ঘন্টা নাই, দরজার গায়ে ছোট একটা কাঠের বাক্স লাগানো আছে, সে কতকটা চিঠির বাক্সের মত। —রজত বাক্সটার দিকে লক্ষ্য করিয়া মনে মনে ভাবিল—কই কোথাওত সে এ ধরণের চিঠির বাক্স দেখে নাই। যদি চিঠির বাক্সই হইবে তবে-তা বাড়ীর পেছনেই বা থাকিবে কেন? ডাক-পিয়নকে কই এ কয়দিনের মধ্যেত একদিনের জন্যও এদিকে আসিতে সে দেখে নাই—আশ্চর্য্য এই বাক্সটার উপরে আবার কোন ঢাকনি নাই—এ দরজাটার সঙ্গে এ বাক্সটা লাগাইবার তবে কি উদ্দেশ্য থাকিতে পারে? কি রহস্য এটার ভিতর গুপ্ত রয়েছে? দরজার পেছনে কিছু একটা ঝুলানো রয়েছে বলে মনে হলো তার।

সে ঐ বাক্সটির দরজাটা খুলিলেই দেখিতে পাইল একটা রবারের নলের মুখ বাক্সের মধ্যে রহিয়াছে, এবং দরজার সঙ্গে তাহা অতি কৌশলের সহিত সংলগ্ন রহিয়াছে। সে বুঝিতে পারিল না কোন্ প্রয়োজনে এই রবারের নলের মুখটা এই দরজার সহিত সংলগ্ন ছোট কাঠের বাক্সটির মধ্যে রাখা হইয়াছে। রজত কৌতূহলি হইয়া রবারের নলটা হাতে লইয়া নাড়াচাড়া করিতে লাগিল এবং দৈবক্রমে যেমন সে নলের মুখের পিত্তলের ঢাকনিটির উপর একটু চাপ দিয়াছে—অমনি এমন একটা আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিল যে তাহার কাছে সম্পূর্ণরূপে ভৌতিক ঘটনার মত মনে হইল।

দরজার অপর দিকে ছিল সর্দ্দার মালীর ঘর সে সন্ধ্যার পর বারান্দার দেওয়ালের গায়ে ঠেলান দিয়া আরামের সঙ্গে তামাক টানিতেছে ও বিশ্রাম করিতেছে, এমন সময় ঐ নলের মুখ হইতে অতি বেগে জলধারা বহিয়া আসিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। মালীর হাত হইতে তাহার প্রিয় হুকাটি খসিয়া পড়িল। মালী তাহার অস্পষ্ট ভাষায় চীৎকার করিয়া উঠিল—পাইপের চওড়া মুখটা দিয়া—জলের ধারা স্রোতের মত বেগে তাহার বারান্দা এবং ঘরের মধ্যে প্লাবন সৃষ্টি করিল।

—রান্নাঘরের মধ্য হইতে দাসদাসীরা অতি দ্রুত সেখানে ছুটিয়া

আসিল। রজতের মুখে আর একটিও কথা নেই, সে স্তম্ভিতের মত নলের মুখটা হাতে করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। মাথাং তাড়াতাড়ি তাহার কাছে আসিয়া কহিল—মাষ্টার রজত, দিন্ দিন্—তাড়াতাড়ি নলের মুখটা আমার কাছে দিন্ নইলে সর্ব্বনাশ হবে। দিন্ দিন্—মাথাং তাড়াতাড়ি নলের মুখটাকে ঘুরাইয়া বন্ধ করিয়া দিল। অমনি জলের ধারা বন্ধ হইয়া গেল। সে আর এক মুহূর্ত্তও কাল বিলম্ব না করিয়া—খিড়কির দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিল—বেচারা সর্দ্দার মালীর ঘর বারান্দা সব জলে জলময়, সে হাঁটু জলভরা ক্ষুদ্র আঙ্গিনার মধ্যে হতভম্বের মত দাঁড়াইয়া বৃষ্টির জলে ভিজিতেছে!

রজতকে বিষণ্ন মুখে মাথাংএর পাশে দাঁড়াইতে দেখিয়া সর্দ্দার মালী ভৎসনার সুরে কহিল—মাষ্টার রজত, আপনি কি কাজ করেই না বসলেন! জলের নলটা খুলে সব জল দিলেন ফেলে আমার গায়ে বলুনত কেমন করে রাত কাটবে—আপনার কি?

মাথাং সর্দ্দার মালীর দিকে চাহিয়া কঠোর কন্ঠে কহিল—চুপকর, সর্দ্দার! মাষ্টার রজত ইচ্ছে করেত তোমার গায়ে জল দিবার জন্য আর নলের মুখ খোলেন নি—জানতেন না বলেই দৈবাৎ এমন অকান্ড করে ফেলেছেন! যাও ঘরে—যাও।

সর্দ্দার মালী আর একটিও কথা না বলিয়া রাগে গন্ গন্ করিতে করিতে তাহার ঘরের বারান্দায় উঠিয়া গেল। এসময়ের মধ্যেই তাহার ঘরের ভিতরকার ও বারান্দার জল এবং আঙ্গিনায় জল নর্দ্দামার মুখ দিয়া যেমন বেগে ঢুকিয়াছিল, তেমনি বেগে বাহির হইয়া যাইতেছিল। এইবার মাথাং স্নেহভরে—রজতের দিকে চাহিয়া কহিল—কি করেছেন বলুনত—বৃষ্টির জলে আর এই নলের জলে যে সারা শরীর ভিজে গেছে। যান্—তাড়াতাড়ি ঘরে গিয়ে কাপড়-চোপড় ছেড়ে ফেলুন।

রজত সর্দ্দার মালীকে লক্ষ্য করিয়া কহিল:—আমি খুবই দুঃখিত হয়েছি মালী, আমি জানতাম না যে ও জিনিষটা কি, আর না জেনে নলের মুখটা চেপে ধরেছিলাম, এতটা যে বিপদ ঘটবে তা আমি জানতে পারি নি।

রজতের কথায় মালীর রাগ শান্ত হইল। রজত তাহার ঘরের

দিকে দুঃখিত মনে চলিয়া গেল। ভাবিল, প্রথম দিনকার গোয়েন্দা-গিরির ফললাভ বড় সুবিধার হইল না।

মাথাং রান্নাঘরের মেঝের দিকে চাহিয়া অস্ফুট স্বরে কহিল: আঃ বাঁচা গেল ঘরটা আর ধোয়াতে হবে না! মাষ্টার রজত এবার এবার সাবধান হবেন! আ-হা-হা! বেচারা মালী!

—সতেরো—

কার পায়ের শব্দ!

সত্যিই আমি একটি গর্দ্দভচন্দ্র; কি জব্দই না হয়েছি! অস্ফুট স্বরে নিজের মনে মনে একথা বলিতে বলিতে রজত তাহার ভিজা কাপড়-চোপড় ছাড়িল। ভাগ্যিস মীরা ছিল না। তাহলে কি বিদ্রূপই না সে করিত! এবার বেশ সতর্ক হয়েই চলাফেরা করতে হবে এ-বাড়ীটাতে! নিরাপদে ও নিশ্চিন্ত মনে যাদুপুরীতে বাস করা সম্ভব নয়! —নাঃ আজ আর লাইব্রেরী ঘরে যাব না।'

রজত বাহিরের দিকে চাহিয়া দেখিল, মাঝখানে বৃষ্টির যে একটু বিরাম হইয়াছিল তাহা আর নাই, আবার বেশ জোরে বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে, জানালার গায়ে আসিয়া জলের ঝাপটা লাগিতেছে। মেঘ ডাকিতেছে—বিদ্যুৎ চমকাইতেছে সঙ্গে সঙ্গে বাতাসও বেশ জোরে বহিতেছে! রাত্রি তখন সবেমাত্র নটা সাড়ে নটা হইবে। না, চুপ করিয়া বসা চলে না। সে তাহার ঘরটি হইতে বাহির হইয়া আস্তে আস্তে কার্পেট মোড়া বারান্দার পথ দিয়া নিঃশব্দে চলিল। প্রথমে সে মীরার ঘরের কাছে আসিল। ভিতর হইতে ঘরটি বন্ধ। সে চুপ করিয়া খানিক্ষণ দাঁড়াইল! কোন সাড়াশব্দ নাই। নিশ্চয়ই মীরা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে! মীরার ঘরের পাশ দিয়াই দাদুভাইয়ের ঘরে যাইবার পথ। মীরার ঘর ছাড়িয়া সে সেই ঘরের দিকে গেল এবং দরজার কাছে দাঁড়াইল। ঘরের মধ্যেও আশেপাশে সে শুনিতে পাইল মৃদু পদশব্দ! দরজার হাতল ধরিয়া সে নাড়াচাড়া করিল, দরজাটা ভিতর ও বাহির হইতে তালা বন্ধ। কিন্তু কি আশ্চর্য্য ঘরের ভিতর হইতে অতি স্পষ্ট ভাবে শোনা যাইতেছিল পায়ের শব্দ! কে যেন ঘরের মধ্যে চলাফেরা করিতেছে! মাথাং বা অন্য কোন দাসদাসী এসময়ে এদিকে আসিবে কোন প্রয়োজনে? —সে কখনও সম্ভব নয়!

রজত মনে মনে ভাবিল, তবে কি মীরার ঘরের ভিতরে এমন কোন দরজা আছে যে দরজা দিয়া দাদুর ঘরে প্রবেশ করিতে পারা যায়!

রজতদা এখানে দাঁড়িয়ে কি করা হচ্ছে শুনি? মীরা ঠিক রজতের পেছনে দাঁড়াইয়া প্রশ্ন করিল।

রজত সম্পূর্ণ অতর্কিত ভাবে মীরার কথায় চমকিয়া উঠিল! এবং কহিল: শুনছ মীরা?

কি ভাই?

দাদুভাইয়ের ঘরের ভিতর শুনতে পাচ্ছো না পায়ের শব্দ, কারা যেন চলাফেরা করছে।

মীরা নীরবে কান পাতিয়া রহিল। তারপর হাসিয়া কহিল;—নাঃ কোন শব্দত শুনতে পাচ্ছি না।

এখন বোধহয় থেমে গেছে। তবে জান মীরা আমি এই একটু আগেও শুনতে পেয়েছিলাম—পায়ের শব্দ।

ওঃ! মীরা হাসিয়া কৌতুকের সহিত কহিল, বুঝেছি, তুমি আমার পায়ের শব্দই শুনেছ! —হাঁ ভাই রজতদা, তুমি কি লাইব্রেরী ঘরে গিয়ে গুপ্ত পথের খোঁজ করেছিলে?

না, ভাই মীরা!

আমি একটা খুব অন্যায় কাজ করেছিলাম;—একথা বলিয়া সে একটু আগে সে যে কাজটা করিয়াছিল তাহার সবিস্তারে বর্ণনা করিল।

মীরা রজতের মুখে এই কাহিনী শুনিয়া হি-হি-হা-হা করিয়া উচ্চ হাস্য করিতে লাগিল। তারপরে হাসি সংবরণ করিয়া বলিল—রজতদা ভাই, সর্দ্দার মালীর বকুনির ভাষাটা একবার শুনি! কি মজা! আমায় একবার ডাকতে হয়! তোমার মুখখানা একবার দেখতাম! আঃ তোমার পেটে পেটে এত দুষ্টুমি রয়েছে, সে কি জান্‌তাম!

রজত কি ভাবে কেমন করিয়া ঘটনাটি ঘটিয়া গেল সে কথা মীরাকে বিশদভাবে বুঝাইলেও তাহার হাসি থামিল না দেখিয়া সে মীরাকে অনুযোগের সুরে কহিল:—ভারি দুষ্টু তুমি, আমাকে যদি একটু জানিয়ে দিতে তা হলে কি এমন করে নাস্তানাবুদ হই!

বাঃ রে! আমাকে বলতে দিবার সুযোগ দিলে কি? মস্তবড়

ডিটেক্‌টিভ হয়েছেন মশাই! আমিত বলেছিলাম আমাকে ফাঁকি দিয়ে কোন কাজ করতে যেওনা। দেখলেত তার মজা! পেলেত হাতে হাতে ফল!—হাঁ, এদিকের.........

রজত বলিল,—সে কথা ঠিক্। হাতে হাতেইত তার ফল পেলাম। মীরা হাসিয়া কহিল—মাথাং একদিন বলছিল যে ওটাকে এক সময় চিঠির বাক্স করারই কথা ছিল, কিন্তু পরে বাগানের জল দেওয়ার নলের মুখটা ওখানে রেখে দেওয়া হয়েচে। আমি কত দিন ওর মুখটা চেপে ধরে বাগানে জল দিয়েছি। রজত কহিল, সেজন্য মালীরা সব মন্দ বলেনি?

হুঁ, বললেই হয় কিনা! আমি বুঝি মন্দ বলতে পারি না।

রজত উচ্ছ্বসিত কন্ঠে বলিল—পার না? খুব পারো। মেয়েরা ঝগড়া করতে খুব পটু সে কথা কার জানা নেই বলত?

—মীরা গম্ভীর ভাবে কহিল—তোমরা বড় কম যাও কি না? কে তোমাকে এখানে টেনে নিয়ে এসেছিল, ঝগড়া করতে! রজত কোন কথা বলিল না! —তাহার মনে বারবারই এ প্রশ্নটা জাগিতেছিল—দাদুভাইয়ের ঘরে—তবে কার পায়ের শব্দ শোনা গেল?

—মীরা বলিল, যাই বল রজতদা, আজ এই বৃষ্টির জন্য বেড়ানোটা গেল মাটি হয়ে। এবার ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়! উঃ কি বৃষ্টিই না সুরু হলো।

মীরা একথা বলিয়া তাহার ঘরের দিকে চলিয়া গেল। রজত খানিক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া পরে চিন্তিত মনে সেও তাহার ঘরে চলিয়া গেল।

—আঠারো—

বোলনের—"মিউ মিউ"

পরদিন রজত ও মীরার মধ্যে একটা কলহ বাঁধিয়া গেল। কলহের কারণটা অতি সামান্য। দোষটা কিন্তু রজতের নয়—দোষ ছিল মীরার প্রিয় বিড়াল বোলনের। মীরার বোলন বিড়ালটি একেবারেই সুবোধ ছিল না—মীরার আদরে সে চুরিটুকু করিতেও ছাড়িত না! বিশেষ ভাল খাবার দিকে তার লোভটা একেবারেই ভদ্রলোকের মত ছিল না। মাথাং হয়ত রান্নাঘর হইতে একটু বাহিরে গিয়াছে কোন কাজে, বোলন সেই সুযোগে জানালার ভিতর দিয়া খাবার ঘরে ঢুকিয়া চুরি করিয়া বাহিরে বাগানে চলিয়া গেল তার বন্ধুবান্ধবদের দলে! বেচারী মাথাং কিছু ভাবিয়াও তাহাকে সাজা দিতে পারে না! বাগানের ভিতর সম্পূর্ণ অযাচিত ভাবে একদল বিড়াল আসিয়া বাসা বাধিয়াছিল! বোলন অবসর সময়ে দলে গিয়া মিশিত এবং মীরার কোলে আসিয়া আশ্রয় লইত।

সেদিন রজত যেমন চা খাইবার জন্য খাবার ঘরে ঢুকিয়া তাহার চেয়ারখানিতে বসিতে যাইবে সে সময়ে সেই চেয়ারখানির কাছেই ল্যাজ উঁচু করিয়া বোলন টেবিলে উঠিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিল। তাহা রজত লক্ষ্য করে নাই, না দেখিয়া সে উহার গায়ের উপর পা দিয়া ফেলিল। আর যায় কোথায়? —বোলন সে ভয়ানক ভাবে চীৎকার করিয়া উঠিল ম্যাঁও ম্যাঁও রজত তাহাকে না দেখিয়াই ঐরূপ করিয়াছিল, মীরার হাত হইতে চায়ের পেয়ালা পড়িয়া গেল, সে তাড়াতাড়ি তাহার প্রিয় বোলনকে পরম ব্যস্ততার সহিত কোলে তুলিয়া লইল এবং রজতের দিকে ভ্রূ বাঁকাইয়া কপাল কুঞ্চিত করিয়া কহিল:—দেখ ভাই রজতদা! তুমি ইচ্ছে করে আমার বোলনকে ব্যথা দিলে কেন বলত? একটা না একটা কিছু অকান্ড না করে তুমি কিছুতেই থাকতে পার না! —তারপর সে বোলনকে

পুশি আমার, সোনা আমার, লক্ষ্মী আমার বলিয়া নানা ভাবে আদর করিতে লাগিল। রজত আর হাসি চাপিয়া রাখিতে পারিল না। তাহার হাসিতে হাসিতে দম বন্ধ হইবার যোগাড় হইল।

রজত যে ইচ্ছা করিয়া বোলনকে ব্যথা দেয় নাই, তাহা মীরা কোনরূপেই স্বীকার করিতে চাহিল না—সে ক্রুদ্ধ স্বরে বলিল: তোমার মত দুষ্ট আর নিষ্ঠুর ছেলে আমি দেখিনি! কেন তুমি আমার বোলনকে মারলে বলত! —মীরার চোখ দু'টি ছল ছল করিতে লাগিল। সে তার বোলনকে আদর করিতে বসিল: কাল সারাদিন তোমাকে একটুও আদর করিনি লক্ষ্মী আমার! সোনা আমার! —চল—দেখি আমার ঘরে, সেখানে কার সাধ্য আছে যে তোমাকে ব্যথা দেয়! মীরা রাগে গটগট করিতে করিতে এবং যাইবার সময় ক্রোধপূর্ণ দৃষ্টিতে রজতের দিকে চাহিয়া চলিয়া গেল।

রজত ইচ্ছা করিয়া তার বিড়ালটাকে ব্যথা দেয় নাই, তবে কেন তার এ অন্যায় রাগ ও মন্দ বলা! সে মীরাকে কোনও কথা বলিল না। রজত নীরবে চা পান করিল এবং নিজের মনেই বলিতে লাগিল—উঃ মীরাটা কি কুঁদুলে! থাকগে। মেজাজটা ঠান্ডা হলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। সকালের দিকে আকাশ ছিল নীল ও নির্ম্মল। মেঘের কোন চিহ্নই ছিল না। —রজতের মনে শুধু ঐ কথাটিই বার বার জাগিতেছিল, দাদুভাইয়ের বন্ধ ঘরে—কার ঐ পায়ের শব্দ শোনা গেল! আশ্চর্য্য—না—যত বিপদই হউক না কেন রহস্য ভেদ করিতেই হইবে! সে মহা উৎসাহে আবার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল!

—উনিশ—

লাইব্রেরী ঘরের রহস্য !

যাদুপুরী হইতে রজত বাহির হইয়া বরাবর চলিল সমুদ্রের দিকে। পথে কোন লোকজনের সঙ্গে দেখা হইল না। প্রভাতের সূর্য্য তখনও প্রখর হইয়া উঠে নাই আর সমুদ্রের সেই দূর চক্রবাল-রেখায় তখনও গোলাপী আভা মিলাইয়া যায় নাই। কি সুন্দর শান্ত সমুদ্র. প্রকৃতি যেন সুগভীর স্নেহে আজিকার প্রভাতটিকে পরম মনোরম করিয়া তুলিয়াছে।

রজত ভাবিতেছিল—এ বাড়ীটা রহস্যময়। এ রহস্য উদ্ধার করিবার মত শক্তি কি তাহার আছে! —তবু—তবু সে চেষ্টা করিবেই। সে আনমনে পথ চলিতে লাগিল—মাঝে মাঝে দু'দিকের ঝোপে ঝোপে ফোটা অজস্র নানা বর্ণের অনামী ফুল তুলিতে লাগিল। রজত দেখিল অনেকেই প্রাতঃভ্রমণ শেষ করিয়া বাড়ী ফিরিতেছে। সে পাহাড়ের নীচেকার ঢালু রাস্তাটি ধরিয়া ক্রমাগত হাঁটিয়া চলিয়াছে—এমন সময় সে সহসা শুনিতে পাইল কে যেন তাহাকে পেছন হইতে ডাকিতেছে: মাষ্টার রজত কোন দিকে যাচ্ছেন? কি সুন্দর প্রভাতটি বেশ ভাল লাগছেত?

রজত মুখ ফিরাইয়া দেখিল, মিঃ মাহেন তার সেই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পোষাকটি পরিয়া—হাসিমুখে তাহারই চলা পথ ধরিয়া আাসতেছে!

রজত মিঃ মাহানের কথার উত্তরে কহিল.—হাঁ অতি সুন্দর লাগছে! আপনি কি শুধু বেড়াতেই বেরিয়েছেন?

মাহান কহিল—না আমার ওদিকে একটু কাজ আছে। জানেনত আমাদের যা-কিছু সামাণ্য ক্ষেত-খামার আছে তা আমরা নিজেরাই লোকজন রেখে চাষ আবাদ করে থাকি। বৃষ্টি হয়ে গেছে এবার চাষের সুবিধা হবে তাই লোকদের একটু কাজের তাগিদ দিতে

যাচ্ছি—যাবেন আমার সঙ্গে? চলুন না—বেশ ভাল লাগবে আপনার।

রজত হাসিয়া কহিল—বেশ হবে! চলুন না?

মিঃ মাহান বলিল—আপনার যাদুপুরীতে দিন কেমন যাচ্ছে? মীরার সঙ্গে ভাব হয়েছেত? —তার বোলন বেড়ালের সঙ্গেও ভাব করেছেনত?

রজত হাঁটিতে হাটিতে কহিল: সেইত হল মুস্কিল। জানেন কাল তার বেড়ালটাকে হঠাৎ আমি না দেখে পা দিয়ে মাড়িয়ে দিয়েছিলুম, তারই ফলে মীরা ভয়ানক রেগে গেছে! আমার সঙ্গে বসে চা খেলে না, দেখাই দিলে না!

হোঃ হোঃ করিয়া মিঃ মাহান্ উচ্চ হাস্য করিয়া কহিলেন—তবেত বড় মুস্কিল হয়েছে। জানেন মীরা যখন প্রথম এখানে এল, কি ঝঞ্চাটেই পড়েছিলুম, কথায় কথায় অভিমান, কথায় কথায় পথে বেরিয়ে পড়ে ছুট দিত—তারপর সয়ে গেল সব। বোলন যোটবার পর হয়েছে এই আর এক বিপদ, অত বড় লোভী বেড়াল আর দেখবেন না—মাস্টার রজত, কতবার মাথাংএর সঙ্গে পরামর্শ করেছিলাম, চুপি চুপি ওটাকে সরিয়ে দিই—ওরে বাবা! —যেন বাচ্চা ন্যাকড়ে বাঘ আর কি! ধরে কার সাধ্যি—যেতে দিন না দুদিন! যাকগে ওনিয়ে ভাববেন না! আমার বোনদেরও ঐ স্বভাব! আজ আমি যাদুপুরীতে এই আপনার সঙ্গেই ফিরবো মনে কচ্ছি—লাইব্রেরীতে কিছু কাজ করবার আছে!

রজত লাইব্রেরী নামটা শুনিয়া সচকিত হইয়া উঠিল। মিঃ মাহেন বলিতে লাগিল—লাইব্রেরীর কাজ শেষ করে আপনার ও মীরার সঙ্গে গল্প করে বাড়ী ফিরবো ভাবছি!

—মিঃ মাহেন ও রজত যখন মাহেনদের খামার বাড়ীতে আসিল, তখন রজতের কাছে অসমতল বিস্তৃত শ্যামল প্রান্তরের শোভা অতিশয় মনোরম বলিয়া মনে হইল। চাষীরা লাঙ্গল চষিতেছে। বাগানের একদিকের অংশে প্রচুর শাকসব্জী ফলিয়াছে। সুপুষ্ট গাভীর দল—স্বচ্ছন্দ মনে বিচরণ করিতেছে ও গোচারণ ক্ষেত্রে সজল শ্যামল ঘাস তাদের উদর পূর্ণ করিতেছে। নানা জাতীয় পশুপক্ষী ও সেখানে সযত্নে প্রতিপালিত হইতেছে।

মিঃ মাহেনকে দেখিয়া—সেখানকার পরিচালক দ্রুত ছুটিয়া আসিল এবং তাহাদের দুইজনকে তাহার বাসগৃহের বারান্দায় নিয়া দু'খানি মোড়াতে বসিতে দিল। —মাহেনের সঙ্গে বর্মী ভাষায় চাষবাসের নানা কথা আলোচনা করিল, ওদিকে সুদক্ষা গৃহকর্ত্রী বড় দুইটি পেয়ালাতে ভরিয়া টাটকা দুধ আনিয়া উভয়কে পান করিতে দিল।

রজত সবিস্ময়ে দেখিল—সারি সারি গোলা ভরা ধান, বিবিধ প্রয়োজনীয় শস্যরাজি সঞ্চিত রহিয়াছে। মিঃ মাহেন হাসিতে হাসিতে কহিল:—'জানেন এ-সব দিকে আমার বাবার বিশেষ লক্ষ্য, তাঁরই যত্নে এই বিরাট খামার বাড়ী গড়ে উঠেছে। আমাদের কোন জিনিষ কিনে খেতে হয় না, বরং দু'পয়সা বেশ লাভ হয় সব খরচ খরচা মিলিয়ে!

সুদূর বিস্তৃত প্রান্তরের দূরে দূরে নবঘন নীল পাহাড়ের শ্রেণী চলিয়াছে। মুক্ত বাতাস এই স্থানটিকে করিয়া তুলিয়াছে পরম রমণীয়! সেখানে তাহারা কিছুকাল ঘুরিয়া ফিরিয়া সব দেখিল—তারপর দুইজনেই যাদুপুরীতে ফিরিয়া আসিল।

মিঃ মাহেন যাদুপুরীতে পৌঁছিয়াই বরাবর লাইব্রেরী ঘরে ঢুকিল এবং উহার দরজা সশব্দে বন্ধ করিয়া দিল। তারপর রজত শুনিতে পাইল লাইব্রেরীর সেই দরজাটি ভিতর হইতে চাবি দিয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল—শোনা গেল অতি পরিস্কার ভাবে চাবি ঘোরানোর শব্দ।

রজত আনন্দিত হইল—সে মনে মনে ভাবিল নিশ্চয়ই মাহেন লাইব্রেরী ঘরের গুপ্ত পথে সেই বাগানের মধ্যকার ঘরে গিয়া কাজ করিবে। যদি সে কোনরূপ উঁকি দিয়া ঘরের ভিতরটা দেখিতে পাইত তবে কি চমৎকারই না হইত! কিন্তু লাইব্রেরী ঘরের কোথাও বেশী জানালা নাই, মাত্র একটি জানালা আছে, তাহাও এত উপরে যে কোনরূপেই সেখান হইতে ভিতরের দিকে লক্ষ্য করিবার সম্ভাবনা নাই। কি করিবে সে! জানালাটি বাগানের দিক হইতে প্রায় ছয় সাত হাত উঁচুতে অবস্থিত—শুধু একটা পাইপ ছাদ পর্য্যন্ত উঠিয়া গিয়াছে জল নিঃসরণের জন্য। যদি ঐ পাইপটি বাহিয়া জানালা পর্য্যন্ত উপরে উঠা যায় তবে তাহা সম্ভব হইতে পারে। —ওটা যে

পিচ্ছল, তাও কি সম্ভব? —রজত দু'একবার চেষ্টা করিয়া অতি কষ্টে যখন পাইপটি বাহিয়া জানালার কাছাকাছি আসিল—এবং উৎসুক ভাবে জানালার ভিতর দিয়া চুপি দিতে গেল, তখন হঠাৎ সে পিছলাইয়া ভীষণ শব্দে মাটিতে পড়িয়া গেল! তাহার হাতের অনেকটা ছড়িয়া গিয়াছিল। রজত এদিক ওদিক চাহিয়া তাড়াতাড়ি গা ঝাড়া দিয়া—সোজা হইয়া দাঁড়াইল এবং মনে মনে বলিতে লাগিল—যদিও ঘরের ভেতর কিছুই দেখতে পেলাম না, তবু নিশ্চয় জানি যে—মিঃ মাহেন কখনও লাইব্রেরীর ঘরের ভিতর ছিলেন না। —নিশ্চয়ই—

সে সেখান হইতে চুপি-চুপি তাহার পড়ার ঘরে আসিল এবং একখানি বইয়ের খাতা খুলিয়া নাড়া-চাড়া করিতে লাগিল। কিন্তু তাহার কান লাইব্রেরীর ঘরের দিকে ছিল নিবদ্ধ। একটু পরেই তাহার কানে আসিল লাইব্রেরী ঘর খোলার শব্দ! এবং খানিক পরেই—মিঃ মাহেন আসিয়া তাহার পাশে দাঁড়াইল। পাঠ-নিরত রজতকে লক্ষ্য করিয়া কহিল—কি বই পড়ছেন? নিশ্চয়ই পাঠ্য পুঁথি নয়!

রজত হাসিয়া কহিল, আপনার অনুমান সত্য। Wrieless এর একটা বই পড়ছি।

ভূতের গল্প আর এ্যাডভেঞ্চার ছেড়ে যে আপনি বিজ্ঞানের বই পড়তে মন দিয়েছেন এতে খুশী হলেম।

রজত কহিল—মিঃ মাহেন আপনি এতক্ষণ কি করছিলেন লাইব্রেরী ঘরে—

মিঃ মাহেন সে বিষয়ে কোন কথা না বলিয়া কহিলেন—দেখুন মাষ্টার রজত, আপনি সাঁতার জানেন কি?

কেন বলুনত?

অনেকদিন ভেবেছি—আমাদের এই যাদুপুরীর যে একটি বেশ বড় জলিবোট আছে—তার নাম ও 'যাদুপুরী' সেখানাতে করে আমরা সমুদ্রের বুকে যে একটা ছোট প্যাগোডা দ্বীপ আছে সেখানে চড়ুইভাতি করতে যাব। সুন্দর যায়গাটি—দু'টি প্যাগোডা আছে—ছোট পাহাড় আছে আর কত যে ফুল অজস্রভাবে সেখানে ফুটে থাকে দেখলে মুগ্ধ হবেন। যাবেন আপনারা?

মীরাকে রাজী করবে কে বলুনত?

মিঃ মাহেন হাসিয়া কহিলেন—সে আপনি করবেন?

রজত বলিল: তবেই হয়েছে!

আচ্ছা সে দেখা যাবে! —তারপর সে কহিল চমৎকার প্রস্তাব আপনার। কতদিন ভেবেছি—দূর সমুদ্রের বুকে ওই যে সোণার টিপের মত ঝকমক করে ক্ষুদ্র ওই দ্বীপটি কি ওটি? —বাঃ কি মজাই না হবে! সে উল্লাসিত হইয়া উঠিল মাহেনের এই প্রস্তাবে। মিঃ মাহেন বলিল, তাহলে কাল সকাল আটটার মধ্যে আমাদের দেখা হবে—সমুদ্রের পারে—পাহাড়টির নীচু সৈকতে। আমি রান্না বান্নার সব যোগাড় করে নিব।

বেশ! তবে মীরাকে আপনি আগে এসে রাজী করাবেন তারপর এক সঙ্গে যাওয়া যাবে। —কিন্তু—সে দেখা যাবে! একথা বলিয়া মিঃ মাহেন আপন মনে শীষ দিতে দিতে দ্রুতপদে চলিয়া গেল!

—কুড়ি—

সুড়ঙ্গ পথের সন্ধানে

মিঃ মাহেন চলিয়া গেলে পর—ধীরে ধীরে রজত লাইব্রেরী ঘরে আসিল। তাহার মনের মধ্যে যে কৌতূহল এবং আবিষ্কারের একটা মোহ জাগিয়াছিল তাহার সার্থকতার জন্য সে সত্য সত্যই ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিল। লাইব্রেরীর চারিদিকের প্রাচীর সে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া তাহার মনে হইল কোথাও কোন গুপ্ত-পথ থাকিবার সম্ভাবনা সেখানে থাকিতেই পারে না। তারপর তিনটি দেয়ালের সবটা যায়গা জুড়িয়া সুন্দর কারুকার্য্যখচিত আলমারীগুলি বইয়ে ভরা। মেজে হইতে ছাত পর্য্যন্ত স্তরে স্তরে বইয়ের পর বই সোনার জলে নাম লেখা তকতকে ঝকঝকে একেবারে ঝলমল করিতেছে। দাদুভাই যে একজন পন্ডিত লোক, বই পড়িতে ভালবাসেন তাহা তাঁহার এই লাইব্রেরীতে সংগৃহীত বইগুলি দেখিলেই মনে হয়। একদিকের দেয়ালের গা ঘেঁষিয়া একখানা কুষান চেয়ার রহিয়াছে। চেয়ারখানার উপরেই একটি বড় জানালা। তাহার পাশে আর একখানী দামী সেগুন কাঠের তৈরী চেয়ার, এ চেয়ারখানি দেয়ালের কোণে আছে। মাঝখানে বড় একটি গোল টেবিল—সেকেলে ধরণের পায়াগুলো খুবই মোটা মোটা। টেবিলের একপাশে একখানি আরামকেদারা দেয়ালের পাশে দরজার অল্প দূরে রাখা হইয়াছে। লাইব্রেরী ঘরের সাজ-সরঞ্জামের মধ্যে এক'টি জিনিষ ব্যতীত আর কিছুই ছিল না।

তুমি কি সুড়ঙ্গের গোপন পথ খোঁজবার জন্য চুপি চুপি এখানে এসেছ?

পেছন হইতে শোনাগেল মীরার কন্ঠস্বর। তাহার কথার সুরে রজতের মনে হইল মীরার রাগ ও অভিমান আর বিরক্তির ভাবটা

নাই। কিন্তু চোখের কোণে তখনও যেন সামান্য একটু রাগের দীপ্তি ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

রজত মুখ ফিরাইয়া মীরার দিকে চাহিয়া মৃদু স্বরে কহিল—হ্যাঁ ভাই, তবে বড় সহজ ব্যাপার নয়।

আমি কিন্তু তোমায় পথের সন্ধান বলে দিতে পারি। জান, দাদুভাই আমায় বলেছিলেন যদি এ ঘরের কোন রহস্য আবিষ্কার করতে চাও তাহলে কোণের ঐ জানালার ধারের চেয়ারটার উপর বসবে। একথা বলিয়া মীরা রজতকে আঙ্গুল দিয়া কোণের চেয়ারটা দেখাইয়া দিয়া মৃদুহাস্য করিল।

রজত সন্দিগ্ধভাবে বলিল:—তুমি কেন তবে ঐ চেয়ারে বসে একটা নূতন কিছু আবিষ্কারের গৌরব নিলে না?

হাঁ বসেছি বই কি? তারপর ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কহিল,—তবে কি জান ভাই আমি ত আর তোমার মত বুদ্ধিমান নই—আর আমার এসব দিকে তেমন উৎসাহও নেই, খাই দাই বেড়াই—বেশ আছি, ওসব ঝঞ্চাট দিয়ে আর কি হবে? তোমার যদি ভয় হয় তবে আমি বলছিনাযে আমার কথা শোন!

রজত ক্ষুব্ধ হইল। একটা ছোট মেয়ে কিনা করবে তার সাহস ও নির্ভীকতার উপর সন্দেহ! না—না এমন অপমান সে সইবে কেন? ছেলেরা শৈশব হইতেই কোন সমবয়সী মেয়ের কাছ হইতে বা বয়সে ছোট মেয়ের কাছে কোনরূপেই ছোট হইতে চায় না। রজত স্বভাবতঃই অভিমানী। কাজেই মীরার কথার মধ্যে যে ব্যঙ্গের একটা সুর ছিল তাহা সে মানিয়া লইবে কেন? রজত তৎক্ষণাৎ নিজের নির্ভীকতা দেখাইবার জন্য চেয়ারখানির উপর গিয়া বসিল। সেই উঁচু চেয়ারটাতে বসিয়া সে যেমন পেছনের দিকে হেলান দিয়াছে, অমনি চেয়ারের পেছন হইতে লোহার মত শক্তভাবে একটা কোমরবন্ধের আকারের কি যেন তড়াক করিয়া বাহির হইয়া তাহার কোমর কঠিনভাবে জড়াইয়া ধরিল! রজত চেয়ারের সহিত কঠিনভাবে বাঁধা পড়িল। তাহার আর নড়িবার চড়িবার কোন শক্তিই রহিল না। মীরা রজতের এই সংকটাপন্ন অবস্থা দেখিয়া হাসিতে হাসিতে ঘরের এদিকে ওদিকে আনন্দে ছুটাছুটি করিতে লাগিল। রজত মীরার দিকে ক্রুদ্ধপূর্ণ দৃষ্টিতে একবার চাহিয়া ঐ

বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিল। বৃথা চেষ্টা। চেয়ারের দুইদিকের হাতলের সঙ্গে এমন ভাবে ঐ কঠিন চর্ম্মের বন্ধনীটি সংযুক্ত ছিল যে রজত কোনরূপেই নড়াচড়া করিতে পারিতেছিল না। অবশেষে সে একান্ত নিরুপায় হইয়া কহিল:—মীরা, এস আমাকে মুক্ত করে দাও।

বল, যে তুমি বোলনকে মেরে খুব অন্যায় কাজ করেছ, স্বীকার কর আমার কাছে যে আর আমার বোলনকে মারবে না! যদি দোষ করেছ বলে ক্ষমা চাও—তবে—

মীরার কথা শুনিয়া রজত রাগিয়া বলিল—একটা বিড়ালের উপর ভারিত দরদ তোমার! আমাকে তাড়াতাড়ি এসে মুক্ত করো!

মীরা দুষ্টামির হাসি হাসিয়া বলিল:—স্বীকার না করলে কিছুতেই তোমাকে ছাড়ছি না। বল যে তুমি দোষ করেছ! —যাই কর না কেন—পেছনের দিকে হাতও নিতে পারবে না মুক্তও হতে পারবে না! কি মজা! হা—হা—হা।

মীরার এই ব্যবহারে রজতের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল। সে এদিক ওদিকে নড়াচড়া ও এপাশ-ওপাশ করিতে লাগিল! শেষটায় পেছনের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া হঠাৎ লুকানো স্প্রিংয়ের নাগাল পাইল, স্প্রিংয়ের গায়ে হাত লাগানো মাত্র দুই দিক হইতে নিমেষ মধ্যে সেই কঠিন বন্ধনী আবার সরিয়া গেল।

রজত মুক্ত হইবা মাত্র চেয়ার হইতে একেবারে লাফাইয়া উঠিল—সে কাঁপিতেছিল! উঃ কি বাঁধনেই না সে বাঁধা পড়িয়াছিল। মুক্তির কি অপূর্ব্ব আনন্দ! সে আস্তে আস্তে জানালার পাশে গেল। বাহিরের দিকে চাহিয়া দেখিল কি সুন্দর উজ্জ্বল ধরণী।

মীরার মুখে দুষ্টামীর ভাবটা চলিয়া গিয়াছে। সে রজতের দিকে চাহিয়া অনুতপ্ত কন্ঠে বলিল:—রজতদা, আমি তোমাকে একটু রাগাচ্ছিলাম, কিছু মনে করো না ভাই!

রজত গম্ভীর ভাবে কহিল—আমি এমন বোকা নই যে তোমার কথায় রাগ করবো! আমিও তো রেগে গিয়ে তোমায় অনেক কটু কথা বলেছি! বোলনকেত আমি ইচ্ছে করে ব্যথা দিই নি—দৈবে হয়ে গিয়েছিল। আমি একটা বিড়ালকে ইচ্ছা করে মারতে যাব বলত কেন? নিরীহ জীব!

না—না সে আমি বুঝতে পেরেছি। আমারি দোষ হয়েছিল—এস আমরা দু'জনে আবার মিলে মিশে চলবো! মীরার এই কথায় রজত হিল—এস দেখা যাক কি ব্যাপারটা।

মীরা রজতকে চেয়ারের পেছনে যে লুকানো স্প্রীংটা আছে সেটা দেখাইয়া দিল। তারপর বলিল দাদামশাইয়ের নানা রকমের অদ্ভুত কিউরো' সংগ্রহ করবার একটা বাতিক আছে। এ-বাড়ীটার নাম যাদুপুরী' রেখে সব দিক দিয়েই এ-বাড়ীটিকে 'যাদুপুরী' করবার জন্য ছিল তাঁর একটা মস্ত ঝোঁক।

মীরা—

শোনা গেল কে একটি মেয়ে মীরাকে ডাকিল।

মীরা বলিল—দেখে আসি কে আমায় ডাকছে! সে অতি দ্রুত লাইব্রেরী ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

মীরা চলিয়া গেলে পর—রজত আবার সেই চেয়ারখানির কাছে গিয়া চেয়ারখানা বেশ ভাল করিয়া পরীক্ষা করিতে লাগিল! সে চেয়ারের মাঝখানটা আঙ্গুল দিয়া একবার দুইবার টিপিবামাত্রই ঘটাং করিয়া একটা শব্দ হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে বাক্সের ডালার মত একটা অংশ উঠিয়া আসিল। —সে দেখিল চেয়ারের মাঝখানটার ভিতরে একটা কোটর আছে। সেই কোটরের মধ্যে একখানি কাগজ পড়িয়া রহিয়াছে।

রজত তাড়াতাড়ি কাগজখানি তুলিয়া লইয়া চেয়ারের সেই ডালাটি ফেলিয়া দিল। খটাং করিয়া একটি শব্দ হইবার সঙ্গে সঙ্গে আবার সব ঠিক হইয়া গেল—কে বুঝিবে যে চেয়ারটা এইরূপ কৌশলে গড়া! কাগজখানিতে কি লেখা আছে তাহা পড়িবার জন্য সে যখন সমুৎসুক হইয়া উঠিয়াছে এমন সময় শোনা গেল—মীরার পায়ের শব্দ! সে তাড়াতাড়ি চিঠিখানি পকেটের ভিতর রাখিয়া দিল।

মীরা ফিরিয়া আসিয়া ঘরের মেজেতে যে পারস্য দেশের গালিচা পাতা ছিল তাহা সরাইয়া ফেলিয়া হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া মেজটা পরীক্ষা করিতে লাগিল।

রজত তাহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিল,—মীরা যদি কোন গুপ্ত-পথ থাকার সম্ভাবনা থাকে তাহলে মেজের ভিতর দিয়ে তা থাকা

সম্ভব বলে মনে হয়! তারপর সে ঝুঁকিয়া পড়িয়া টেবিলটার নীচটার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিল—দেখেছ এ যায়গার মেজটায় ফাঁকা আওয়াজ হচ্ছে, স্ক্রু দিয়ে শক্ত করে আঁটা। —লাইব্রেরীর ঘরের মেজটা ছিল কাঠের তৈয়ারী।

মীরাও কৌতূহলি হইয়া যায়গাটা পরীক্ষা করিল—ঠিক কথা। ফাঁকা বলেইত মনে হচ্ছে। দেখি—রান্নাঘরে একটা স্ক্রু ড্রাইভার আছে সেটা নিয়ে আসি। নইলে এই কাঠগুলো সরানো সহজ হবে না—উঃ যে শক্ত করে স্ক্রু দিয়ে আঁটা।

যাবার দরকার নেই! দেখা যাক কি করা যায়। আমার মনে হয় কি জান, নিশ্চয়ই কোন না কোন কৌশল আছে এখানকার কাঠগুলো



বাক্সের ডালার মত একটা অংশ উঠিয়া আসিল

খুলে ফেলবার। মীরার সঙ্গে সঙ্গে বোলনও আসিয়াছিল। বোলন ঘরের মেজটাতে ম্যাও ম্যাও করিয়া ল্যাজ তুলিয়া এবং মীরার পায়ে মাথা ঘষিয়া বেড়াইতেছিল। বোলন হঠাৎ মেজের এক দিকের একটা ছোট ছিদ্রের মধ্যে তাহার সামনের হাতের থাবা দিয়া আঁচড়াইতে আরম্ভ করিল,—সে হয়ত ভাবিয়াছিল কোন ইন্দুর হয়ত ওর ভিতর লুকিয়ে আছে!

রজত কহিল,—বোধহয় তোমার বোলন সন্ধান পেয়েছে—গর্ত্তটা ওখানেই হওয়া সম্ভব! একবার তোমার বোলন কে সরাও দেখি।

—মীরা বোলনকে কোলে তুলিয়া লইল। রজত সেই ছোট ছিদ্রের মধ্যে আঙ্গুল ঢুকাইয়া দিয়া উপরের দিকে টানিবামাত্রই অতি সহজে দু হাত চওড়া এবং চার হাত লম্বা একটি ঢাকনি ঝপাং করিয়া উপরের দিকে উঠিয়া আসিল। তখন দেখা গেল—একটি সুগভীর গর্ত্ত নীচের দিকে বহুদূর পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে—গাঢ় অন্ধকারের জন্য ভিতরের কিছু দেখা যাইতেছে না।

রজত ব্যস্ত সমস্ত ভাবে বলিল:—মীরা, লাইব্রেরীর দরজাটা বন্ধ করে দাও। সাবধান! কেউ যেন এদিকে না আসে। আমার সঙ্গে ইলেকট্রিক টর্চ্চ আছে। দেখা যাক না নীচে কি আছে। মীরা রজতের কথানুসারে তৎক্ষণাৎ দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

রজত বলিল: আমি গর্ত্তের ভিতর নেমে যেতে চাই। তুমি সাবধানে সবদিকে নজর রেখো। এই কথা বলিয়াই টর্চ্চটি হাতে করিয়া সে সুড়ঙ্গের মধ্যে নামিয়া পড়িয়া বলিল:—মীরা নামবার অসুবিধা হচ্ছে না। একটা দড়ির সিঁড়ি পেয়েছি—আমি এই নেমে যাচ্ছি—

মীরা বলিল:—আমিও আসব কি?

রজত কহিল—না—না—এখন নেম না। একটু অপেক্ষা করো!

-একুশ-

সুড়ঙ্গ পথে

হাঁ মীরা এই আমি অনেকটা নেমে এসেছি। এই বারোটা সিঁড়ি পার হলেম। খুব ঠান্ডা লাগছে!

মীরা বলিল—রজতদা ভাই আমিও আসছি, কি বল। কিছু ভয় নেই। আর আমি তোমার সঙ্গে সুড়ঙ্গ পথে নেমেছি শুনলে দাদুও আমায় কিছু বলবেন না। তুমি হলে আমার অভিভাবক!

নীচ হইতে শোনা গেল রজতের হাসি। সে বলিল তবে নেমে এসো—সাবধানে নেমো! দড়ির সিঁড়িটি বড় বেশী দোলে, খুব শক্ত করে ধরো। বারোটা ধাপ নামলেই পাবে মাটি। আমি এখন শক্ত মাটীতে দাঁড়িয়ে রয়েছি। একটা সুড়ঙ্গ দিয়ে হু হু করে হাওয়া আসছে। উঃ কি ভীষণ ঠান্ডা—! এসো নেমে এসো! হাঁ—হাঁ এই যে এসে পড়েছ।

মীরা আসিয়া রজতের পাশে দাঁড়াইল। —এখন দেখা যাক এই সুড়ঙ্গ-পথটা কোন দিকে এগিয়ে গেছে। তুমি ঠিক যেন মীরা এ—পথটা ঠিক ঐ বাগানের ভিতরকার ঘরের মধ্যে গিয়ে পৌছেচে।

মীরা কহিল—উঃ কি ভয়ানক স্যাঁৎসেতে! আর দেখতে পাচ্ছো কেবলি চলেছে নীচের দিকে—এমন সময় হঠাৎ মীরা একটা শিলায় হুঁচোট খাইয়া পড়িল এবং হাসিয়া উঠিল। রজত কহিল—একেই বলে 'এ্যাডভেঞ্চার'!

তাহারা দুই জনে কখনও হামাগুড়ি দিয়া, কখনও একরূপ শুইয়া চলিতে চলিতে অবশেষে এক যায়গায় একটা দেয়ালের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। সেখানেও দেখা গেল লাইব্রেরী ঘরের মত দড়ির সিঁড়ি ঝুলানো আছে—দুই জনে সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিয়া দেখিল—বাগানের মধ্যের সেই ঘরের মেজের উপর আসিয়া

দাঁড়াইয়াছে। রজত ও মীরা তাহাদের এই জয়যাত্রার সাফল্যে আনন্দিত হইল।

মীরা বলিল: রজতদা, দাদুভাই কি অদ্ভুত ভাবেই না এ পাতালপুরীর পথ তৈরী করেছিলেন।

রজত তার টর্চ্চটি ফেলিয়া চারিদিকে দেখিতে পাইল ফোটোগ্রাফির বিবিধ যন্ত্রপাতি, কোণে টিপয়ের উপর একটা সুবৃহৎ ক্যামেরা বসানো রহিয়াছে। অন্যদিকে একটা লোহার সিন্ধুক, ঘরের অপর পাশে একটা রোল টপ ডেক্স বা ঘোরানো ডেক্স, তার উপরে নানা কাগজ পত্র ছড়ানো রহিয়াছে।

রজত কহিল ঐ দেখ মীরা এক পাশে একটা ল্যাম্পও আছে।

ল্যাম্পটা জ্বালাও ভাই রজতদা, যদি টর্চ্চটা নিবে যায়। বাবা! ফেরবার সময় ওই পাতালপুরীর পথে আমি অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে যেতেই পারবো না।

আমিও আঁধার পথে ফিরতে পারবো না!

ল্যাম্প জ্বালাইল। তারপর মীরা বলিল: দাদুভাই দেখছি ফোটোগ্রাফ তুলতেও খুব ভালবাসেন।

হাঁ ভাই। রজত ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিল অন্য দিকে একটি নূতন ক্যামেরা আছে—সে সেইটিও বেশ ভালভাবে পরীক্ষা করিয়া বুঝিল ঐ হইতেছে কলার ফোটোগ্রাফির ক্যামেরা। ঐ ক্যামেরাটি দেখিয়া রজত আশ্চর্য্য হইল এবং মীরাকে বলিল—তবে কি দাদু নিজে এই ক্যামেরা আবিষ্কার করে ?

আশ্চর্য্য কিছু নয়, দাদুভ সর্ব্বদাই কিছু না কিছু একটা নূতন করবার জন্য মন দিতেন। একথা বলিয়া মীরা ডেক্স টেবিলটার পাশের চেয়ারটাতে ধপ করিয়া বসিয়া পড়িল।

রজত একে একে ঘরের সব জিনিষ পত্র বেশ মনোযোগের সহিত পরীক্ষা করিতে লাগিল। কতরকমের যন্ত্রপাতি, কত ছবি যে বিক্ষিপ্ত ভাবে পড়িয়া আছে তাহার অবধি নাই। সে আশ্চর্য্য হইয়া বলিল: মীরা এইবার এই এ্যালবামটা দেখ, উঃ কত দেশের কত ছবিই না রয়েছে, কত মানুষ, নানা দেশের নানা লোকের বিচিত্র চিত্র! দেখেছ একটা আলমারী বোঝাই কেবল এ্যালবাম! আমার মনে হয় কি জান? দাদু নানা জিনিষের আবিষ্কার ভালবাসেন বলেই, পাছে

লোকজনেরা এসে বিরক্ত করে, সেজন্য বাড়ির নাম রেখেছিলেন—'যাদুপুরী'।

শোন, রজতদা, দাদুভাইয়ের রুবির খনিতে একটা বর্মন কাজ করত, লোকটা ছিল ভয়ানক ধূর্ত্ত, সে দাদুভাইয়ের অনেক টাকা চুরি করে পালায়, সেজন্য তার নামে হয় মোকদ্দমা, কয়েক বৎসরের জন্য তার হয়েছিল জেল, সে জেল থেকে বেরিয়ে এসে একদিন দাদুভাইকে ভয় দেখিয়ে বললে—তোমাকে আমি জব্দ না করে ছাড়ছি না! একদিন তোমাকে......তারপর থেকেই দাদুভাই সাবধানে থাকেন। কারু সঙ্গে দেখাই করেন না। গোপনে এই ঘরে বসে ফোটোগ্রাফি ও লেখাপড়ার কাজ করেন। অনেক সময়ই বাইরে বাইরে থাকেন, কোথায় যে থাকেন তাও বড় একটা জানা যায় না, এ-বাড়ীতে যখন থাকেন, তখনও বোঝা যায় না, কোথায় আছেন।

রজত বলিল: বড় আশ্চর্য্যত! কই তুমিত আমাকে এত দিন এ সম্বন্ধে কোন কথা বলোনি?

মীরা বলিতে লাগিল:—দাদুভাই আমাকে বলতেন, দেখ তুমি নিজের উপর নির্ভর করে সব কাজ করবে, কোন কাজেই পেছ-পা হবে না। এ-বাড়ীর কোথায় কি আছে তাও খুঁজে বার করবে, আমি কিন্তু কিছু বলবো না! মাহেন আর দাদুভাই এখানে যে এসে দু'জনে মিলে মিশে নানা কাজ করে থাকেন, সে সংবাদ আমি রাখি। কিন্তু আমি জানতাম না যে লাইব্রেরীর ভিতর দিয়ে এখানে আসবার একটা সুড়ঙ্গ-পথ আছে। রজত একথা কয়টি শুনিয়া চুপ করিয়া রহিল। তারপর মীরাকে জিজ্ঞাসা করিল, আর কি কিছু তুমি জান?

জানি, তবে সে কথায় তোমার তেমন কিছু দরকার হবে না!

তবু বলোনা শুনি!

আমি জানি সেই যে দাদুভাইয়ের শত্রুতা করে তার নাম হচ্ছে মংথিবোং। মাঝে মাঝে দাদুভাইয়ের শোবার ঘরে শোনা যায় পায়ের শব্দ, কে জানে বাপু, মংথিবোংই কাগজ পত্র খুঁজে বেড়ায় কিনা!

রজত বলিল, অসম্ভবত নয়! আমিও পায়ের শব্দ শুনতে পেয়েছি।

এইসব ছড়ানো কাগজপত্রগনলো সাবধানে লোহার সিন্দনকে তনলে রাখলেই ভাল হয়, কি বল মীরা!

সে কাজের ভার রয়েছে মাহেনের উপর। ঐ দিকটাতে আমাদের ভাববার কিছন নেই।

রজত বলিল,—সাবধান, আমরা যে সনড়ঙ্গপথের সন্ধান জানতে পেরেছি, সে কথা খবরদার—মাহেনকে বলোনা কিন্তু! —এমন কি দাদনভাইকেও পত্র লিখতে এসব কোন কথা লিখ না। আমাদের নিজেদের মধ্যেই কথাটা গোপন রাখা ভালো—কি বল?

না—ঠিক জেনো কাকেও বলব না। তবে জান একবার আমি দাদনভাইয়ের বসবার ঘরে বসেছিলাম, সে সময়ে দাদনভাই একটা কাগজে বেগননি রংয়ের কালিতে কি যেন লিখেছিলেন,—মাহেনের সঙ্গে বলাবলি কচ্ছিলেন—মাহেন একদিন আমার এই আবিষ্কারে পৃথিবীর লোকের হবে মহদনপকার। তোমাকে কিছন বললেন না—কি আবিষ্কার করলেন?

মীরা চনপ করিয়া রহিল, কোন কথা বলিল না।

রজত আশ্চর্য্য হইয়া কহিল: তাইত এখানেত কোন বেগননি কালিতে লেখা কাগজপত্র দেখতে পাচ্ছি না! হয়ত লোহার সিন্দনকটার ভিতর থাকতে পারে। তা'হলে ঠিক আছে।

মীরা বলিল: চল এবার ফিরে যাই। মাহেন বলে গেছে সে তাড়াতাড়ি খাওয়া দাওয়া সেরে এসে আমাদের নিয়ে যাবে দ্বীপটাতে বেড়াতে—মনে আছে তোমার! কি জানি যদি সে এর মধ্যে এসে পড়ে! দনইজনে আবার সেই সনড়ঙ্গ পথ ধরিয়া লাইব্রেরীতে আসিল এবং রজত যত্নসহকারে লাইব্রেরী ঘরের সেই সরানো কাঠ ইত্যাদি সযত্নে রাখিয়া দিল। তারপর রান্নাঘরে মাথাংকে তাড়াতাড়ি খাবার দিতে বলিয়া নিজের ঘরে আসিল—মীরাও তাহার ঘরের দিকে গেল।

সে লাইব্রেরীতে চেয়ারের ভিতর যে চিঠিখানি পকেটে লনকাইয়া রাখিয়াছিল এইবার সেই চিঠিখানি পকেট হইতে বাহির করিয়া পড়িল। চিঠিটা অদ্ভনতভাবে আরম্ভ হইয়াছে;

"তনমি ভাববার অনেক সময় পেয়েছ। তনমি ঠিক জেনো যদি আমি নিজে এ-বিষয়ে চেষ্টা করতাম তাহলে সহজেই জানতে পারতাম। মনে রেখো শ্রাবণ মাসের শেষ তারিখ পর্য্যন্ত আমার এই প্রতিশ্রনতি

থাকবে। যদি তুমি এ-সময়ের মধ্যে আবিষ্কারের বিষয়টি জানাতে পার, তবে ভাল হয় এবং প্রতিশ্রুত পুরস্কার দিতে কুন্ঠিত হব না—৩০শে শ্রাবণ দ্বিপ্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত, আমার এই প্রতিশ্রুতি থাকবে বলবৎ—আমাকে ৩০শে শ্রাবণ রাত্রি দ্বিপ্রহরের মধ্যে পৌছে দিলে আমি সঙ্গে সঙ্গেই তোমাকে আমার প্রতিশ্রুতি মত টাকা দিব—এবং ভবিষ্যতে আমি তোমাকে আমার অংশীদার করবো। যদি তুমি তোমার প্রতিশ্রুতি মত কাজ করতে না পার, তবে সব কথার শেষ সেখানেই হবে। তোমার কোন ভয়ের কারণ নেই, বুড়োর নাতি যে ছোকরাটা বোম্বে থেকে এসেছে, তার ঘাড়েই দোষ পড়বে, মস্ত বড় সুযোগ হেলায় হারিয়োনা।"

থ· ব·

রজত এই চিঠিখানা দু'দুইবার পড়িল। চিঠির অর্থ অতি সুস্পষ্ট। সে ভয়ে ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িল। তাহার মুখ একেবারে শাদা হইয়া গেল। থ· · কি তবে থিবোং দাদুভাইয়ের আবিষ্কারের তথ্যটুকু জানবার জন্য টাকা দিতে চাইছে, এ-চিঠি কাকে উদ্দেশ্য করিয়া লেখা? দাদুভাইয়ের আবিষ্কারের রহস্য সে জানতে চাইছে।

বিস্মিত রজত ভাবিতে লাগিল, কে হ'তে পারে? মাহেন্—না—না সে কি সম্ভব!

— বাইশ —

চিঠির কথা

রজত তাহার ঘরের জানালার পাশে বসিয়া নিজ মনে বলিতে লাগিল; 'না—না মিঃ মাহেন কখনও বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারেন না। আমি এ চিঠি দিয়ে কি করবো তাই ভাবছি।

একবার ভাবিল মাহেনের কাছে গিয়া এ চিঠিখানা দেখালেইত ব্যাপারটার সহজভাবে মীমাংসা হয়ে যেতে পারে। মাহেন যদি সত্যই হয় বিশ্বাসঘাতক তবে সে এ চিঠি দেখে কখনই তার দোষ স্বীকার করবে না, বরং আপনার নির্দ্দোষিতা প্রতিপন্ন করবারই চেষ্টা করবে। তারপর দাদুভাই মাহেনকে খুবই স্নেহ করেন, তিনি কি সহজে মাহেনের এই বিশ্বাসঘাতকতার কথা মেনে নেবেন? মনে হয় না। মাহেন যে তাঁর একান্ত বিশ্বাসের পাত্র। তবে এক কাজ করলেইত বেশ হয় দাদামশাইকে এখানে ফিরে আসবার জন্য লিখলেই ভাল হয়। এই সব নানা কল্পনা-জল্পনা সে আপনার মনে করিতে লাগিল। না—না এমন একটা গুরুতর সংবাদ গোপন রাখাও ত তার পক্ষে সম্ভব নয়! এ-সম্বন্ধে কারো সঙ্গে পরামর্শ করাই ভালো। মীরাকে বলা না বলা সমান! মাহেনকে সে কোন সন্দেহই করবে না। মনে হয় একবার পাদ্রী লগসডেল সাহেবের সঙ্গে পরামর্শ করলে ভাল হয়। তাঁকে সকলেই ভালবাসেন ও বিশ্বাস করেন। আমি তাঁর কাছেই চিঠিখানা নিয়ে যাব। মনের ভিতর একটা সন্দেহ ও অবিশ্বাস নিয়ে মাহেনের কাছে যাওয়া চলে না।

এমন সময় মীরা ডাকিল: রজতদা খেতে এসো। খাবার দেওয়া হয়েছে।

আসছি ভাই—একথা বলিয়া চিঠিখানা পকেটে পুরিয়া নীচে খাইতে গেল। মীরার কাছে কোন কথা বলিবে না স্থির করিয়া সে নিত্যকার মত স্বাভাবিক ভাবে ঐ চিঠির কথা তাহার বারে বারে মনে

পড়িতে লাগিল। সে মীরাকে জিজ্ঞাসা করিল:– দাদুভাই কবে নাগাদ ফিরে আসবেন জান মীরা?

হাঁ। তিনি ২০শে তারিখ ফিরে আসবেন এবং মাসের বাকী সব কটা দিন এখানেই থেকে যাবেন।

তুমি কি এখানে আর থাকতে চাও না?

রজতের মনে তখন জাগিতেছিল তার বাবা, মা ও বোনদের কথা। মনে পড়িতেছিল পড়াশুনার কথা। তাকে মানুষ হতে হবে। মনে পড়িতেছিল সেই ট্রেনে দেখা অদ্ভুত প্রকৃতির বৃদ্ধের সেই সতর্কবাণী! তবে কি তাহাকে এখানে বিপন্ন হতেই হবে!

মীরা ডাকিল:—রজতদা!

রজত কোন উত্তরই দিল না। সে আনমনে নানা কথা ভাবিতেছিল।

মীরা কহিল:– রজতদা, তুমি কি কানে শুনতে পাও না? আমি যে তোমাকে তিন চারবার ডাকলাম, কেন কোন সাড়া দিচ্ছনা বলত?

হঠাৎ ঘুম হইতে জাগিলে যেমন মনের ভাব হয়, ঠিক সেই ভাবে সে চমকিত হইয়া কহিল: –তাই নাকি! আমি কিছুই শুনতে পাই নি!

আজ যে আমাদের বেড়াতে যেতে হবে সে কথাও কি ভুলে গেলে?

না—না –তাইত! তবে আজ না গেলে হয় না?

কেন বলত?

রজত বলিল:—পাদ্রী লগস্‌ডেল সাহেবকে আমার বড় ভাল লেগেছে, একবার তাঁর ওখানে বেড়াতে যাব ভেবেছি। যাবে তুমি আমার সঙ্গে?

মীরা বলিল:—বেশত!

এমন সময় মাহেন বেশ পরিপাটি রকমে পোষাক পরিয়া সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং সহাস্যমুখে কহিল:—কি বলেন মাষ্টার রজত আজ যাবেনত সেই পেগোডা দ্বীপে বেড়াতে? আমি কিন্তু তৈরী হয়ে এসেছি। বেশী দেরী করে লাভ নেই সন্ধ্যার আগেই ফিরে আসতে হবেত!

রজত খানিকক্ষণ পর্য্যন্ত মাথা উঁচু করিয়া তাহার দিকে চাহিতে পারিতেছিল না। তাহার মনে হইতেছিল এই মাহেনকি বিশ্বাসঘাতক হতে পারে? এমন সদয় ব্যবহার! আবার মনে পড়িল সেই একদিন বনপথে আকস্মিকভাবে তাহাকে আক্রমণের কথা। কে সে? এখনও তাহার কাছে রহস্যময়। সে মনের ভাব গোপন রাখিয়া মাহেনের দিকে চাহিয়া কহিল:– আজ যাওয়া হবে না মিঃ মাহেন। আমার শরীরটা ভাল নয়!

মাহেন উঃ বলিয়া হাসিয়া কহিলঃ তাইত! আশাকরি তেমন গুরুতর কোন ব্যারাম হয় নি! চলুন না একবার সমুদ্রের ধারে বেড়িয়ে আসি. আমাদের 'যাদুপুরী' বোটটা দেখতে পাবেন। মিঃ গুপ্ত অনেক টাকা খরচ করে তৈরী করেছেন। এস–না মীরা!

মীরা কহিল: পাদ্রী সাহেবের কুঠিতে একবার বেড়াতে যাব ভাবছি। আচ্ছা চলুন সাগরের দিক থেকে বেড়িয়ে আসি। সেখান থেকে ওদিকে যাওয়া যাবে. কি বল রজতদা!

রজতের ইচ্ছা ছিল না পাদ্রী সাহেবের ওখানে যাবার কথাটা মীরা বলে। মীরাকে সে এ বিষয়েত মানা করেনি. কাজেই দোষ তাকে দেওয়া চলে না।

মাহেন তাহার চুরুটটা ধরাইয়া লইয়া মৃদু হাস্য করিয়া কহিলেন: বেশ তাই যাবেন এখন!

তিন জনে মিলিয়া সমুদ্রের দিকে গেল। এ পথ এখন তাহাদের অত্যন্ত প্রিয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সেই বনবীথি. সেই ঝরণা. সেই নির্ম্মল নীল আকাশে মাথা তোলা নীল পাহাড়ের শোভা তাহাদের মুগ্ধ করিয়াছিল। ধীরে ধীরে তাহারা তিনজনে সমুদ্রের পাড়ে আসিল। সেখানকার সৈকতভূমি বেশ বিস্তৃত। সমুদ্রের একটা ছোট ফাড়িতে ছিল মিঃ গুপ্তের বোট যাদুপুরী বাঁধা।

মাহেন তাহাদের লইয়া বোটখানিতে আসিয়া উঠিল। মাঝখানে একটি সুন্দর জায়গা। তাহাতে বেশ গদি মোড়া বেঞ্চ. টেবিল. একটি আরামকেদারা. যা কিছু আরামের সবই ছিল। রজত ও মীরা বোটের সাজ-সজ্জা দেখিয়া বিস্মিত হইল। রজত কিভাবে পাল টাঙাইতে হয়. হাল ধরিতে হয় মোটরটির কোথায় কি বসানো আছে সে সব বেশ মন দিয়া দেখিল। মাহেন ও বোটের চালক তাহাদের সব বুঝাইয়া দিল।

বোটখানি ছোট হইলেও খুব দ্রুতগামী। রজতের ইচ্ছা হইল সেদিনই তাহারা প্যাগোডা দ্বীপের দিকে চলিয়া যায়।

রজত কহিল:—মিঃ মাহেন, কাল কিন্তু আমিই 'যাদুপুরী' চালিয়ে নেব।

মাহেন কহিল:—সে হবে না মাষ্টার রজত! সমুদ্রের বুকে বোট চালানো বড় সহজ নয়, তারপর আপনার মত ছেলে মানুষের পক্ষে। সাঁতার জানাও দরকার। আপনি সাঁতার জানেন কি?

জানি, তবে ওস্তাদ সাঁতারু নই।

সেদিন আর বেশী কোন কথা হইল না। সহসা মাহেন কহিল:—মীরা, তোমরা দু'জনে সাবধানে যাবে। আমায় এক্ষুনি বাড়ী ফিরতে হবে। আমার বাবার অসুখটা অত্যন্ত বেড়ে গেছে কি না! একথা বলিয়া অতি দ্রুতপদে মাহেন চলিয়া গেল। রজত সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। সে মীরাকে কোন কথাই বলিল না।

দুইজনে পাদ্রী লগসডেল সাহেবের বাড়ীর পথ ধরিল। পথ চলিতে চলিতে রজত কহিল:—মীরা, একটা আশ্চর্য্যের কথা এই আজ কদিন থেকে বাড়ীর একখানা চিঠিও পেলাম না। মা, চিঠি পেলেই জবাব দেন, কেন দিচ্ছেন না? আমি এখানে এসে পর পর তিনখানা চিঠি তাঁকে লিখেছি।

বেশত, ডাকঘর হয়ে গেলেই বেশ হবে। সেখানে খোঁজ করো।

তা বটে। দেখ, কলকাতা কিংবা বোম্বেতে ডাকহরকরারা চিঠি বিলি করতে দেরী করে না। তোমাদের এই ব্রহ্মদেশে সবই উল্টো।

মীরা কোন কথা কহিল না। রজত ডাকঘরে গিয়া একখানি চিঠি পাইল। রজতের মা রজতকে চিঠি লিখিয়াছেন। রজত মার লেখা চিঠিখানি পাইয়া তাড়াতাড়ি পড়িয়া বেশ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল।

গীর্জ্জার কাছাকাছি আসিতেই শোনা গেল ঢং ঢং করিয়া গীর্জ্জার ঘন্টা বাজিতেছে। ঘন্টা থামিলে পর উপাসনা আরম্ভ হইল। তাহারাও সকলে পেছনে একখানি বেঞ্চের উপর বসিয়া পাদ্রী সাহেবের গুরুগম্ভীর কন্ঠে বাইবেলের উপদেশ বাণী শুনিতে

লাগিল। রেভারেন্ড লগস্‌ডেল সাহেবের দীর্ঘ বলিষ্ঠ শরীর, বক্ষ বিলম্বিত শুভ্র শ্মশ্রু, মুখের মধ্যে একটা দৃঢ়ভাব এবং চক্ষু দুইটির মধ্যে যে করুণার দীপ্তি প্রকাশ পাইতেছিল তাহা ছিল অপূর্ব্ব।

রজত পাদ্রীসাহেবের সুন্দর উপদেশপূর্ণ বক্তৃতা শুনিয়া মুগ্ধ হইল। প্রেমও ভালবাসাই যে হইতেছে মানবের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। মানুষে মানুষে কলহও অশান্তি এবং বিদ্বেষ যে সমাজের মধ্যে নৃশংস বর্ব্বরতার সৃষ্টি করে, সেকথা বলিতেছিলেন। বলিতেছিলেন উদাত্তকন্ঠে তোমাদের মধ্যে যে কেহ মহৎ হইতে চায়, সে তোমাদের পরিচারক হইবে; এবং তোমাদের মধ্যে যে কেহ প্রধান হইতে চায়, সে তোমাদের দাস হইবে; যেমন মনুষ্যপুত্র পরিচর্য্যা পাইতে আসেন নাই, কিন্তু পরিচর্য্যা করিতে, এবং অনেকের পরিবর্ত্তে আপনার প্রাণ মুক্তির মূল্য রূপে দিতে এসেছিলেন।" কি সুন্দর কথা। উপাসনা শেষ হইবার পর তাহারা দুইজনে গীর্জ্জাঘরের দেয়ালে লাগানো ছবিগুলি দেখিতে লাগিল। এদিকে রেভারেন্ড লগস্‌ডেল সাহেব তাঁহার বেশ পরিবর্ত্তনের জন্য ভিতরে চলিয়া গেলেন। রজতকে গীর্জ্জা ঘর হইতে বাহির হইবার কোন উদ্যোগ করিতে না দেখিয়া মীরা জিজ্ঞাসা করিল:—চল রজতদা। বাড়ী যাবে না!

রজত কোন কথা বলিল না। তারপর আস্তে আস্তে মীরার সহিত গীর্জ্জার বাহিরে চলিল। তাহারা গেটের বাহির হইয়া আসিয়াছে এমন সময় পেছন হইতে শোনা গেল পাদ্রীসাহেবের স্বর— তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন:—তোমাদের কি আমার সঙ্গে কিছু দরকার আছে? রজত উত্তরে মুখ ফিরাইয়া কহিল—আপনার সঙ্গে কি আমি একটু কথা বলতে পারি?

খুব পারো। বেশত তোমরা এস আমার সঙ্গে। শুনছো মীরা আমার বিড়ালটার চারটা খুব সুন্দর বাচ্চা হয়েছে! দেখবে এস। মীরা একেবারে আনন্দে লাফাইয়া উঠিল। তারা দুইজনে পাদ্রী-সাহেবের বাড়ী পেঁাছিলে মীরা তাড়াতাড়ি তাঁহার বাড়ীর ভিতর বিড়ালের বাচ্চা দেখিতে গেল।

রেভারেন্ড লগস্‌ডেল সাহেবের সহিত রজত তাঁহার পড়িবার ঘরে আসিল। পাদ্রী সাহেব বলিলেন:—ঐ আর্মচেয়ারটায় আরাম করে বস, মাষ্টার রজত! তারপর নিজের হাতে সে ঘরের দরজাটা

বন্ধ করিয়া দিলেন। একথা বলিয়া তিনি চ্বর্বট ধরাইয়া পরমানন্দে উহা টানিতে লাগিলেন, ও রজতকে বলিলেন:—ত্বমি কি বলতে চাও, মাষ্টার রজত এইবার বল।

রজত ভাবিয়াছিল শ্বধ্ব চিঠির কথাটাই বলিবে কিন্তু সে বলিতে আরম্ভ করিয়া একে একে সব কথাই বলিয়া গেল, কোন কিছ্বই গোপন করিল না এবং সে চিঠিখানা রেভারেন্ড লগস্‌ডেল সাহেবকে পড়িতে দিল। সে শ্বধ্ব মাহেনের প্রতি তাহার সন্দেহের কথাটি গোপন করিল।

লগস্‌ডেল সাহেব—সব কথা শ্বনিয়াও বিন্দ্বমাত্র কৌত্বহল প্রকাশ করিলেন না বা কোনর্বপ বিস্ময়ের ভাবও দেখাইলেন না। যখন সে সব কথা বলিয়া যাইতেছিল, তখন রেভারেন্ড লগস্‌ডেল নীরবে চ্বর্বট টানিয়া যাইতেছিলেন, রজতের কথা শেষ হইলে চিঠিখানা তাহাকে ফিরাইয়া দিয়া চেয়ারে ঠেস দিয়া চ্বপ করিয়া বসিয়া রহিলেন।

—তেইশ—

কোন্‌ পথে?

এখন আমাদের আলোচনা সেই সূত্র হতে আরম্ভ করা যাক কেমন মাষ্টার রজত।

রজত বলিল:—তা হলেই ঘটনাটা বেশ পরিষ্কার হয়ে যাবে।

রেভারেন্ড লগস্‌ডেল সাহেব আর একটা বড় চুরুট ধরাইয়া লইয়া বলিতে লাগিলেন:—ট্রেনে যে বৃদ্ধ ভদ্রলোকের সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছিল, তাঁর তোমাকে সতর্ক করে দেবার উদ্দেশ্য বোধ হয় ছিল ভাল, যাদুপুরীতে তোমার কোন বিপদ ঘটা অসম্ভব নয় তা তিনি জানতেন বলেই মনে হয়।

হাঁ। তাঁর চিঠি হতেই বুঝতে পেরেছিলাম যে এখানে এলে আমার বিপদঘটা অসম্ভব নয়!

যে লোকটা তোমাকে সেদিন বাড়ী ফিরবার পথে আক্রমণ করেছিল,—সে ইচ্ছে করলে তোমাকে গুরুতরভাবে আহত করতে পারত, কিন্তু সে তা করে নি।

রজত কহিল: শুধু আমাকে ভয় দেখানোই বোধ হয় তার ইচ্ছা ছিল।

বেশ। লগস্‌ডেল সাহেব মৃদু হাস্য করিয়া বলিলেন: তোমার দাদামশাইয়ের আবিষ্কৃত ফোটোগ্রাফির নূতন তথ্য জানবার জন্য এই যে একটা গোপন ষড়যন্ত্র চলছে, তার মধ্যে তোমাকে জড়িয়ে ফেলে কৌশলে নির্দ্দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পক্ষে অপর পক্ষের কি স্বার্থ থাকতে পারে আর তোমার দাদামশায়ের যে পুরাণো কর্ম্মচারীর কথা বলছো, সে আমার অজানা নয়, থিবোংএ সঙ্গে যে আমার খুব ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল তাও নয়, সে যদিইবা তার শত্রুতা সাধন করার জন্য এ চিঠিখানা কাকেও লিখে থাকে, তবে সে লোকটি কে? কাকে তুমি সন্দেহ করতে পার?

রজত—আমি মনে করি—হঠাৎ তাহার মুখ দিয়া মাহেনের নাম আসিতেছিল—তাহা গোপন করিয়া কহিল: আমি কাকে সন্দেহ করবো বলুন?

তা ঠিক। তোমাকে তোমার দাদামশাই এ ব্যাপারে সন্দেহ করবেন, ভুলেও তা মনে করো না। আমি তোমার এ চিঠিওত দেখছি। এখন খুঁজে বের করতে হবে দুটি লোককে। একজন যে তোমার দাদুভাইয়ের রুবির কারখানায় কাজ করতো, আর দ্বিতীয় লোক যাকে উদ্দেশ্য করে চিঠি লেখা হয়েছে। আমার উপদেশ এই—তুমি চিঠিখানা যেখানে পেয়েছিলে ঠিক সেখানেই রেখে এসো। ঐদিকে সর্বদা শুধু নজর রাখবে এই মাত্র বলতে পারি।

—আপনি কি একথাই বলেন? লগস্‌ডেল সাহেবের কথায় রজত অনেকটা মুষড়াইয়া পড়িল।

পাদ্রী সাহেব মৃদু হাসিলেন মাত্র। তারপর বলিলেন:—মাষ্টার রজত, তোমার দাদামশাই এখন এখানে নেই, থাকলে পরে তাঁকে চিঠিখানা দেখানো যেত। এটা তুমি লক্ষ্য করেছ কি যাকে প্রলুব্ধ করে এই চিঠি দেওয়া হয়েছে সে প্রলুব্ধ হয় নি। তুমি বিশেষ করে দৃষ্টি রাখবে যাদুপুরীর সেই লাইব্রেরী ঘরের দিকে সেখানে কেউ গোপনে চলাফেরা করে কি না! তোমার কাছে এ কাজটা তেমন কঠিনও হবে না।

সে বোধহয় পারবো। —কিন্তু এ চিঠিটা গোপনে আমার কাছে রাখলে কেমন হয়?

তা'হলে কেমন করে অপরাধীকে ধরতে পারবে বলত? আমার মনে হয় সে ঠিক হবে না।

আচ্ছা আমি মীরার কাছে কি এ চিঠির কথা বলতে পারি?

রেভারেন্ড লগস্‌ডেল সাহেব একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন: না এখন তাকে বলা ঠিক হবে না। শেষ পর্য্যন্ত সব না দেখে বা সঠিক ভাবে না জেনে তাকে বলা ভাল হবে কি? তবে একটা কথা হচ্ছে মীরা বড় বুদ্ধিমতী মেয়ে—সুচের মত তার সূক্ষ্মবুদ্ধি, আর তুমি তার সাহায্য পেতে পার। বুঝলে? দরকার হলে আমিও তাকে সব কথা বুঝিয়ে বলবো।

রজত কহিল:— আপনার পরামর্শ মেনে নেওয়াই ভাল। একথা

বলিয়া পাদ্রী সাহেবের কাছ হইতে চিঠিখানা তুলিয়া লইয়া পকেটে পুরিল।

মাষ্টার রজত, এজন্য তোমার ভ কোন হেতু নেই। আমার মনে হয় এ-ব্যাপারটার মীমাংসা হতে বেশী দেরী হবে না। তোমার ছুটির আনন্দ নষ্ট করবার কোন হেতু নেই।

রজত হাসিয়া বলিল—আমার ছুটীটা এখানে বেশ আনন্দেই কেটে যাচ্ছে।

রেভারেন্ড লগস্‌ডেল সাহেব তাঁহার চুরুটের শেষাংশ ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিয়া সস্নেহে রজতের কাঁধে একখানা হাত রাখিয়া কহিলেন: দেখ মাষ্টার রজত, কোন এ্যাডভেঞ্চার করতে গেলেই জানবে—বিপদকে টেনে আনা। কোন এ্যাডভেঞ্চারের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লে শেষ পর্য্যন্ত না দেখে ফিরে আসা চলে না। যখন কাজে হাত দিয়েছ, তখন বিপদের ভয়ে মুখ ফিরালেত চলতে পারে না। যে কাজ করতে নেমেছ, তার চারদিক ঘিরে আঁধার জমেছে দেখে পেছ পা হয়ো না। তারপর হাসিয়া বলিলেন: "আর ইউ নার্ভাস?"

রজত দৃঢ়কন্ঠে কহিল: ফাদার, আমি মোটেই নার্ভাস নই। ভয় কি জানি না। এ্যাডভেঞ্চার জিনিষটা আমার খুবই ভাল লাগে—শত বিপদেও আমার ভয় হয় না। রজতের সঙ্গে কথা বলিতে বলিতে—ফাদার লগস্‌ডেল দরজার দিকে আসিলেন। এবং হঠাৎ মুখ ফিরাইয়া কহিলেন: মীরাকে ডেকে আনবার আগে তোমাকে একটা কথা বলছি—মাষ্টার রজত।

বলুন ফাদার!

ফাদার লগস্‌ডেল কহিলেন:—দেখ এসব কাজে হাত দিতে হলে আগে থেকে কাকেও অপরাধী মনে করে বিরুদ্ধভাব পোষণ করা ঠিক হয় না। সত্য, সংযম, সাহস এ তিনটি জিনিষ যার আছে তারাই দুঃসাহসিক এ্যাডভেঞ্চারে সফলতা লাভ করে। তুমি আমার কাছে শুধু একথাটি বলে যাও যে—কোন বিষয়ে আমার সঙ্গে আলোচনা না করে—যদি তা একান্তই সম্ভব না হয় তা হলে নিজের মনে বেশ ভাল ভাবে চিন্তা ও আলোচনা না করে সহসা কোন কিছু করে বসো না।

রজত কহিল: আমি আপনার একথা মনে রেখেই চলবো ফাদার।

--ফাদার লগস্‌ডেল মীরার খোঁজে বাড়ীর মধ্যে চলিয়া গেলেন। রজত মীরার অপেক্ষায় বাগানের মধ্যে বেড়াইতে লাগিল।

— চব্বিশ —

ছায়ামূর্তি

হাসিমুখে মীরা বাড়ীর মধ্য হইতে বাহির হইয়া আসিল। ক্ষণকাল দুজনে দুজনের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। মীরা তাহার হাত দিয়া দুইটি বিড়ালের বাচ্চা বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়াছিল।

রজতের পাশে আসিয়া পাদ্রী লগস্‌ডেল সাহেব দাঁড়াইয়া চুপি চুপি বলিলেন, আশা করি, তুমি আমার এ উপদেশ বিস্মৃত হবে না।

রজত কহিল না ফাদার। আমি হঠাৎ কোন কাজ করবো না।

আমি তোমার কথা বিশ্বাস করি।

এইবার মীরা পাদ্রীসাহেবকে কহিল—ফাদার, আমি একটা বিড়ালের বাচ্চা নিব। কি চমৎকার দেখতে হয়েছে।

রেভারেন্ড লগস্‌ডেল হাসিয়া কহিলেন, তোমার বোলন হিংসে করবেনাত?

মীরা মাথা নাড়িয়া কহিল, না।

পাদ্রী সাহেব হাসিয়া বলিলেন—আচ্ছা, একটা নাও, দুটো দিতে পারবো না।

মীরা ও রজত সন্ধ্যার অস্পষ্ট অন্ধকারের মধ্যেই যাদুপুরীতে ফিরিয়া আসিল। মীরা বিড়ালের বাচ্চা কোলে করিয়া তাহার ঘরের দিকে চলিয়া গেল। এদিকে রজতের প্রধান কাজ হইল চিঠিখানা যথাস্থানে রাখিয়া আসা। অতি সহজেই তাহার কাজ হইয়া গেল। সন্ধ্যার পর রজত ও মীরা একসঙ্গে খাইতে বসিল। এবং অন্য দিনকার মত কতকটা সময় গল্প-গুজবে না কাটাইয়া শোবার ঘরে চলিয়া গেল।

অন্যান্যদিনকার মত আজ তাহার ঘুম সহজে আসিল না। তাহার মনের ভিতর নানারূপ জল্পনা কল্পনা খেলিতে লাগিল। কি সে করিতে পারে? তাহার দাদুর আবিষ্কারের গুপ্ত তত্ত্ব জানিয়া যাহারা তাঁহাকে বঞ্চিত করিতে চায়, সেই প্রবঞ্চক দলের প্রতি কি ভাবে লক্ষ্য স্থির রাখিয়া তাহাদের দন্ডিত করা চলে না। তাহার পক্ষে ইহা সম্ভব হইবে কি? এসব নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে সে স্থির করিল—সেই গোপন গৃহের ভিতরে যে সব কাগজ-পত্র আছে, সব সে পড়িয়া তাহার কর্ত্তব্য স্থির করিয়া ফেলিবে। এইরূপ ভাবার



ছায়ামূর্ত্তি অদৃশ্য হইয়া গেল

সঙ্গে সঙ্গেই রজত বিছানা ছাড়িয়া উঠিল ও অতি চুপি চুপি দরজা বন্ধ করিয়া বাহিরে আসিল।

. চাঁদের ক্ষীণ জোছনায় আকাশ ছাইয়া ফেলিয়াছিল। সঙ্গে সে তার টর্চ্চটি নেয় নাই। উপর হইতে সিঁড়ি বাহিয়া তর তর করিয়া নীচে নামিয়া আসিল। তারপর আস্তে আস্তে পা ফেলিতে ফেলিতে লাইব্রেরী ঘরের দিকে চলিল। বারান্দা দিয়া অগ্রসর হইবার সময় সে দেখিতে পাইল—তাহার আগে আগে একটা মানুষের ছায়ার মত কে যেন লাইব্রেরী ঘরের দিকে চলিয়াছে। আশ্চর্য্য সেই ছায়াটির দিকে যাইবার জন্য সে জোরে জোরে পা ফেলিয়া দ্রুত অগ্রসর হইতেই দেখিতে পাইল যে ছায়ামূর্ত্তি সেখান হইতে সরিয়া সিঁড়ি ধরিয়া উপরের দিকে উঠিতে লাগিল। রজত কিছু মাত্র ভীত না হইয়া লাইব্রেরীর দিকে না গিয়া তাড়াতাড়ি সিঁড়ি ধরিয়া উপরে উঠিয়া গেল। সে সিঁড়ির সর্ব্বশেষ ধাপটির উপরে উঠিবামাত্র অস্পষ্ট চন্দ্রালোকে দেখিতে পাইল বিস্তৃত বারান্দার উপর দিয়া কালো পোষাকপরা একটি বেঁটে লোক অতি দ্রুত চলিয়া যাইতেছে। যেখানে বারান্দাটা একটু ঘুরিয়া গিয়াছে সেখানটা বেশ অন্ধকার, সেই অন্ধকারের মধ্যে লোকটি যে কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল, রজত আর কোনরূপেই তাহাকে দেখিতে পাইল না। ক্রিং করিয়া একটি দরজা বন্ধের শব্দ মাত্র শোনা গেল। তারপর সব চুপ! নিমেষ মধ্যে লোকটি কোথায় অদৃশ্য হইল সে তাহার কোন সন্ধান পাইল না।

একটির পর একটি ঘর পার হইয়া শেষটায় সে একেবারে মীরার ঘরের পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। মীরার ঘরের পরে আর কোনও ঘর নাই। তবে ঐ লোকটা কোথায় গেল! —তবে কি ভূ—ত? না সে ভূত-প্রেত বিশ্বাস করে না।

রজত মীরার ঘরের দরজার কাছে কান পাতিয়া শুনিল,—মীরা যেন অস্পষ্টস্বরে চাপা গলায় কাহার সঙ্গে কথা বলিতেছে। সত্যিই কি শুধু কথা? সে যে মাঝে মাঝে আবার হাসিতেছে!

না—না এসময়ে কার সঙ্গে কথা বলে মীরা! দাসীত এ সময়ে থাকার কথা নয়!

ঠক্—ঠক্—রজত মীরার দরজায় ঘা দিল।

ভিতর হইতে উত্তর আসিল,—এত রাত্রে কে গো?

মীরা, আমি। তোমার সঙ্গে কথা আছে। দরজা খুলিয়া গেল। মীরা বাহির হইয়া আসিল—যেন একটি শ্বেতবস্ত্রপরিহিতা ছোট পরী।

মীরা রজতের মুখের দিকে চাহিয়া বিস্মিত হইয়া বলিল,—এত রাত্তিরে আমার সঙ্গে তোমার কি কথা থাকতে পারে বলত!

রজত সে প্রশ্ন এড়াইয়া গিয়া কহিল: আচ্ছা, মীরা, তোমার ঘরে কি আর কেউ আছে?

হাঁ।

কে সে?

মীরা হাসিয়া তাহার বিড়ালটিকে দেখাইয়া বলিল—বোলন। আচ্ছা, রজতদা এখন নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে থাক, আমাকেও ঘুমুতে দাও।

দরজা বন্ধ হইয়া গেল। রজত ও তাহার ঘরের দিকে ফিরিয়া চলিল।

রজত তাহার বিছানায় শুইয়া পড়িয়া নিজের মনে মনে বলিতে লাগিল: মিথ্যা কথা! —মীরা বোলন বিড়ালের সঙ্গে কথা কইছিলো, এ একেবারে মিথ্যা কথা। কি যেন একটা গোপন অভিসন্ধি চলছে, এই ছোট দুষ্ট মেয়েটা সব খবর রাখে। কিন্তু লোকটা গেল কোথায়? কাল বেশ ভাল করে খুঁজে দেখবো, মীরার ঘরের ভিতর দিয়া অন্য কোনও দরজা আছে কিনা। মনে হচ্ছে মীরার ঘরের ভিতর দিয়ে দাদামশাইর ঘরে যাবার কোনও গুপ্তপথ বা দরজা আছে। আমি কাল সব খুঁজে বার করবো—করতেই হবে। লোকটা কে? মিঃ মাহেন যে নয় তা নিশ্চয়ই, এ লোকটা মিঃ মাহেনের মত লম্বা চওড়া নয়। যদি আর কেউ হয়ে থাকে, তবে মাহেন বেচারীকে দোষ দেওয়া বৃথা!

এইরূপ নানাকথা চিন্তা করিতে করিতে সে তাহার ছোট ল্যাম্পটি জ্বালাইয়া লইয়া—একখানি নূতন এ্যাডভেঞ্চারের বইয়ের সবচেয়ে কৌতূহলজনক অধ্যায়টি পড়া সুরু করিল।

-পঁচিশ-

কে এই লোকটি ?

সেদিনকার সেই ঘটনার পর কয়েকদিন আর কিছু ঘটিল না—রজতের মনেও তেমন যেন আর উৎসাহ ছিল না। সে একদিন অতি সংগোপনে মীরা যখন তাহার বোলনকে লইয়া বাহিরের মাঠে ছুটা-ছুটি করিতেছিল এবং তাহার পরিচিত কয়েকজন বান্ধবী আসিয়াও সেখানে জুটিয়াছিল বলিয়া বেশ গল্প গুজব চলিতেছিল, সেই সুযোগে রজত, মীরার ঘরটি বেশ ভাল ভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিল কিন্তু কোন দিক দিয়াই কোন গুপ্ত দ্বার দেখিতে পাইল না—যে পথে তাহাদের দাদুভাইয়ের ঘরে প্রবেশ করা যাইতে পারে। তারপর যে ছায়া মূর্ত্তিটিকে সে সেদিন বারান্দায় দেখিতে পাইয়াছিল তাহাকেও আর সে কোনদিন দেখিতে পাইল না। কতদিন রাত্রিতে সে লাইব্রেরী ঘরে প্রবেশ করিয়া চারিদিকের ঘর-দরজা, জানালা এবং মেজ পরীক্ষা করিয়াছে, কিন্তু কোথাও কোন সন্ধান সে পায় নাই। যে চেয়ারখানার ভিতর হইতে চিঠিখানি পাইয়াছিল, সে-চেয়ারখানা খুঁজিয়া দেখিল যে সেখানে—সে চিঠিখানা আর নাই! কি আশ্চর্য্য! তবে কি চিঠিখানা হস্তান্তরিত হইল! বাগানের সেই গোলাপকুঞ্জের ঘরখানি ও ঘুরিয়া আসিয়াছে কিন্তু কোথাও কোনরূপ সন্ধান মিলে নাই। যেমনটি সে পূর্ব্বে দেখিয়াছিল, সেই ঘরের আসবাব পত্র ঠিক সে ভাবেই আছে, সামান্য জিনিষটিও স্থানচ্যুত হয় নাই। —রজত বলিল, দেখা যাক কি হয়! অবসর সময়টা সর্ব্বদা দুশ্চিন্তার দ্বারা অবসাদগ্রস্ত করিয়া রাখিলেত চলিবে না।

এ অবসর সময়ে সে ঘোড়ায় চড়িতে শিখিতে আরম্ভ করিল, মাঝে মাঝে মিঃ মাহেনের সঙ্গে সে সমুদ্রের ধারে বেড়াইতে যায়—কীট, পতঙ্গ, পোকামাকড় মৎস্য ও বিবিধ জলজন্তুর জীবন-রহস্য জানিবার জন্য হঠাৎ রজতের মনে কৌতূহল জাগিল -অনেক সময়েই মীরা

তাহাদের সঙ্গিনী হইত। মীরাকে ছাড়িয়া তাহাদের এই বেড়ানো ভাল লাগিত না। মীরা যদিও রজত ও মিঃ মাহেনের সঙ্গে সমান তালে হাঁটিতে পারিত না, তবুও সে সঙ্গী হইত। যদি কখনও একটু দূরে যাইতে হইত তাহা হইলে মীরা তাহার ছোট টাট্টুঘোড়াটিতে চাড়িয়া তাহাদের অনুসরণ করিত—কিন্তু পাহাড়ে চড়িতে মীরার দক্ষতা ছিল অসাধারণ,—যেদিন সে তাহাদের সঙ্গে না থাকিত সেদিন তাহাদের কাছে ভ্রমণটা তেমন প্রীতিপদ হইত না।

ক্রমে ঋতুর পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে বর্ষা দেখা দিল। আকাশে কখনও ঘন কালো মেঘ—চারিদিক অন্ধকার করিয়া ঐরাবতের মত ধূম্র শুঁড় নাড়িয়া পৃথিবীর বুকে বৃষ্টির ধারা সিঞ্চন করিত। কখনো কোন দিন বিচ্ছিন্ন মেঘের আড়াল দিয়া সূর্য্যের প্রসন্ন আলোকে চারিদিক উদ্ভাসিত হইত!

মিঃ মাহেনের সঙ্গ রজতের ক্রমশঃই ভাল লাগিতেছিল। একদিন তাহারা তিনজনে বেড়াইতে বাহির হইয়াছে। মাহেন একটু বিষণ্ণ। তাহার ছোট বোন রোজের পীড়া দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে দেখিয়া অত্যন্ত ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িতেছিল। গাছের শুকনো ঝরা পাতার মত সে যেন দিন দিন ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িতেছিল। রজত বলিল, আপনার বোনকে সহরের কোন ভাল ডাক্তার দেখালে পারেন।

মিঃ মাহেন বলিল—দেখিয়েছি, কিন্তু ভাল হবে বলেত মনে হয় না।

তবু আবার ভাল করে চেষ্টা করে দেখুন। রেঙ্গুন থেকে কোন বড় ডাক্তার এনে দেখালেওত পারেন।

মিঃ মাহেন করুণসুরে বলিল,—আমার সাধ্যাতীত, মাষ্টার রজত? জানেন গরীবের চিকিৎসা হয় না। বেশীর ভাগ ডাক্তাররা কসাইয়ের চেয়েও অধম—শুধু টাকাই চেনে—মনুষ্যত্ব তাদের নেই।

দাদুভাই কি আপনার এই বিপদে অর্থসাহায্য করবেন না?

মিঃ মাহেনের মুখখানি এ-কথায় একেবারে অন্ধকার হইয়া গেল। তারপর মৃদুকন্ঠে কহিল—আমার বোনের চিকিৎসার জন্য আমি কারু কাছে হাত পেতে ভিক্ষা নিতে পারবো না।

রজত কোন কথা বলিল না। বিপদে হিতৈষী বন্ধুর সাহায্য নেবে না, কিন্তু তার সর্ব্বনাশ করতে গোপন ষড়যন্ত্র করতেত কোন

সঙ্কোচ নেই—অদ্ভুত বটে! তারপর প্রকাশ্যে হাসিয়া কহিল—বর্মনরা একটু অদ্ভুত ধরণের লোক বটে!

মিঃ মাহেন মৃদু হাস্য করিয়া কহিল—হাঁ কতকটা তাই।

সহসা মিঃ মাহেন—মাথা তুলিয়া এদিকে ওদিকে চাহিয়া কহিল, তাইত, মীরা কোথায়? চলুন মাষ্টার রজত তাকে খুঁজে আসি!

চলুন না ঐ পাহাড়ের উপর যাই, ওখানকার বনফুলগুলি আমার বোনের বড় প্রিয়, কতকগুলি ফুল তুলি গে চলুন।

মিঃ মাহেনের একথায় রজত উৎসাহিত হইল, তাহার মুখে যে কি একটা বিষণ্ণ ভাব ছিল তাহা ও তখন আর ছিল না। রজত বলিল—চলুন, তারপর মাহেনের দীর্ঘ পাদক্ষেপের সঙ্গে সেও সমান তালে পা ফেলিতে ফেলিতে অগ্রসর হইল।

—পরের দিন রজত বাবা-মার কোন চিঠি আসিতেছে কিনা তাহার সন্ধান লইবার জন্য ডাকঘরে গিয়াছিল, সেখান হইতে ফিরিবার পথে—হঠাৎ পথের অন্য দিক দিয়া ফাদার লগস্‌ডেলকে যাইতে দেখিয়া সে তাড়াতাড়ি তাঁহার নিকট দৌড়াইয়া গেল।

ফাদার হাসিয়া কহিলেন,—মাষ্টার রজত, তোমাকে পেয়ে আমি খুব খুশি হয়েছি, আমি তোমার সঙ্গে দেখা করবার জন্য ব্যগ্র হয়েছিলাম। আমার সঙ্গে চল খানিকটা বেড়িয়ে আসবে। তারপর রজতের কাছে আসিয়া বলিলেন—ঐ যে দূরে লোকটিকে দেখছ, একজন মহিলার সঙ্গে কথা কইছেন, তাকে লক্ষ্য কর।

রজত দেখিল—লোকটির মুখখানা বেশ গোলগাল, পুরন্ত মোটা সোটা—দেখিলে মনে হয় লোকটি কোন ধনী ব্যবসায়ী হইবে। তাহার উচ্চ হাসিতে সারা রাস্তাটা মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল। কি জোরেই না—হা-হা-হো-হো করিয়া সে উচ্চ হাস্য করিতেছিল।

রজত কহিল—আমার যতদূর মনে হয় আমাকে যে আক্রমণ করেছিল, তার হাত-পাগুলো ছিল খুবই লম্বা-লম্বা—আর আঙ্গুলগুলো ছিল শক্ত ও সরু।

ফাদার লগস্‌ডেল একটি কথাও বলিলেন না। তিনি শুধু মাথা নাড়িলেন।

আমি ঐ লোকটিকে সেদিন বারান্দার পথে দেখেছি বলেত মনে হয় না!

ঐ যে ভদ্রলোক এ-দিকেই আসছেন। তুমি যেয়ো না। কাছাকাছি বেশ ভাল করে দেখো, আর ওর সঙ্গে পরিচিত হও। এতে কোন আপত্তি নেইত?

রজত হাসিয়া বলিল, না।

—দূরের ঐ ভদ্রলোকটি জোরে জোরে দপ্ দপ্ ধপ্ ধপ্ শব্দ করিয়া পা ফেলিতে ফেলিতে—তাহাদের দিকে অগ্রসর হইল। রজত ভাবিল কে এই লোকটি?

— ছাব্বিশ —

সমস্যার মীমাংসা কোথায় ?

লোকটি অতি দ্রুত ফাদারের কাছে আসিয়াই উচ্চৈস্বরে বলিল:—'ফাদার কেমন আছেন আর এই ছেলেটি কে? পাদ্রী সাহেব তাঁহার চুরুটটি ধরাইয়া বলিলেন—ছেলেটির নাম রজত।

নবাগত ভদ্রলোক হাসিয়া বলিলেন—কি মাষ্টার রজত, আমার নাম শুনেছ? একথা বলিয়াই রজতের সঙ্গে বেশ জোরে করমর্দ্দন করিলেন।

রজত ভদ্রলোকের মুখের দিকে বিস্ময়ের সহিত চাহিয়া রহিল। ভদ্রলোকটি বলিলেন—উঃ বুঝতে পেরেছি, তুমি হচ্ছ মিঃ গুপ্তের নাতি, তাই নয়, হাঁ, বোম্বে থেকে এসেছ কেমন?

রজত কহিল, হাঁ!

বেশ, বেশ, চমৎকার মানুষ তোমার দাদামশাই, ওখানে সাবধানে থেকো!

একথা বলিয়াই সেই স্থূলকায় ভদ্রলোক তাঁহার হাতের মোটা লাঠিটা ঘুরাইতে ঘুরাইতে চলিয়া গেলেন। রজত ভদ্রলোকের কথায় যে বিরক্ত হইয়াছিল তাহা তাহার মুখভঙ্গিতেই প্রকাশ পাইয়াছিল—ফাদারের তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে তাহা এড়ায় নাই। তিনি ধীরভাবে বলিলেন—যাদের তুমি তোমার শত্রু বা অনিষ্টকারী বলে মনে কর, তাদের প্রতি কখনও আকারে-প্রকারে কোন ভাবেই বিরক্তির ভাব প্রকাশ করোনা। শত্রুকে কখনও বুঝতে দিও না যে তুমি তাকে শত্রু বলে চিনতে পেরেছ। তাহলেই ঘটবে বিপদ। এই লোকটির নাম হচ্ছে মংবু ভয়ানক দুষ্টু লোক। তোমার দাদামশাইয়ের প্রতি এর একটা ভয়ানক বিদ্বেষ আছে, কিন্তু অদ্ভুত লোক মংবু, কখনও তাঁকে রাগ করতে দেখা যায় না—সর্ব্বদাই সে সকলের সঙ্গে হাসি মুখে কথা বলে।

দুইজনে রাজপথ ছাড়িয়া মাঠের দিকে আসিতে আসিতে ফাদার জিজ্ঞাসা করিলেন—কোন নূতন খবর আছে কি?

—রজত কহিল, না ফাদার, আমি সেই গুপ্তপথের আশেপাশে কাকেও দেখতে পাইনি। আজ সকালে দাদুভাইয়ের এক চিঠি পেয়েছি—শুধু লিখেছেন আশাকরি তোমার দিনগুলো বেশ ভালই যাচ্ছে। আমি আসছে মাসের পনেরো তারিখে ফিরে আসছি।

তুমি তোমার দাদামশাইকে কি কখনও দেখেছ?

না ফাদার। মার কাছে যা শুনেছি তাতে মনের ভিতর তাঁর চেহারার একটা কল্পনা করে নিয়েছি। দাদামশাইকে মনে হয় ছেলেমানুষ, নইলে এমন অদ্ভুত ধরণের বাড়ী করবেন কেন?,

ফাদার লগস্‌ডেল রজতের কথায় হা-হা করিয়া হাসিলেন এবং বলিলেন: জান মানুষের বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সে কতকটা ছেলেমানুষ হয়—যেমন তোমার দাদুভাই আর আমি হয়েছি। আমি তোমায় শুধু এই কথাই বলছি, চারিদিক দেখে শুনে লক্ষ্য রেখে কাজ করে যেয়ো। তোমার সঙ্গে মাহেনের পরিবারের বেশ সদ্ভাব রয়েছে তাতেই আমি সন্তুষ্ট হয়েছি।

—রজত বলিল—হাঁ, মিঃ মাহেন, যেমন ভাল সাঁতারু, তেমনি ঘোড়সোয়ার, তেমনি আমুদে লোক, আমারও মীরার প্রতি তাঁর ব্যবহার সত্যিই খুব সন্তোষজনক। মিঃ মাহেনের নূতন কিছু একটা করার দিকে ঝোঁক আছে বলে মনে হয় এজন্য দাদামশাই তাঁকে খুব ভালবাসেন।

ফাদার লগস্‌ডেল ঘাড় নাড়িলেন। কোন কথা বলিলেন না। এদিকে লগস্‌ডেল সাহেবের যে বাড়ীতে আসার কথা ছিল, সেখানে তিনি পৌঁছিয়াছিলেন। রজত ফাদারের নিকট হইতে বিদায় লইয়া যাদুপুরীর দিকে আসিল। সে মনে মনে এই ভাবিয়া আশ্চর্য হইয়া গেল যে—তাহার মনের কথা ফাদার কেমন করিয়া জানিতে পারিলেন।

রজত দেখিল মীরা তাহার সঙ্গিনীদের সঙ্গে বাগানের এক পাশে বেঞ্চিখানার উপর গিয়া গল্প করিতেছে। সে সেই দিকে কোন লক্ষ্য না করিয়া—বাগানের দেয়ালের একপাশে গিয়া লক্ষ্য করিতে লাগিল কি ভাবে দেওয়াল টপকানো সম্ভব! অত বড় উঁচু দেওয়ালের উপরে

উঠা তার মত কিশোরের পক্ষে ত আর সম্ভব নয়! বাগানের সেদিকে একজন যুবক মালী কাজ করিতেছিল—সে রজতকে লক্ষ্য করিয়া কহিল—মাষ্টার রজত কি দেওয়াল টপকাতে চান নাকি? একথা বলিয়া মালী হাসিল।

রজত লক্ষ্য করিল, সেখানে দেওয়ালের পাশে একটা গাছের গোড়াটা বেশ বড়, একেবারে দেওয়ালের গা ঘেঁষিয়া উঠিয়াছে। ঐ গাছের উপর উঠিলে ডাল ধরিয়া সহজেই দেওয়ালের উপর উঠিতে পারা যায়। কিন্তু ওখানকার প্রাচীরের উপর তিন ইঞ্চি উঁচু করিয়া ভাঙ্গা কাচ এমন ভাবে বসানো আছে যে ওখানে পা দিয়ে দাঁড়ানোই বিপজ্জনক!

রজত মালীকে কহিল, যদি কোন চোর ডাকাত দেওয়াল টপকে লাফিয়ে পড়ে, তা হলে কি কর?

মালী রজতের কথার সঙ্গে সঙ্গেই একটা বড় রকমের পাথরের ঢিল লইয়া ওখানকার ঘন লম্বা ঘাসের মধ্যে ছুঁড়িয়া দিল, সঙ্গে সঙ্গে—প্রপাতের জলের মত অতি বেগে কর্দ্দমাক্ত জলরাশি ভীষণ ভাবে দেয়াল পর্য্যন্ত উঠিয়া চারিদিক কর্দ্দমাক্ত করিয়া তুলিল। অদ্ভুত কৌশল বটে!

রজত বলিল—দাদামশাইত বড় সহজ মানুষ নন। বাড়ীটা চারিদিক দিয়েই একেবারে যাদুপুরী করে তুলেছেন।

সে ধীরে ধীরে—তাহার ঘরে ফিরিয়া আসিয়া একখানি চেয়ারে বসিয়া বই পড়িতে লাগিল। হঠাৎ চোখ তুলিতেই নজরে পড়িল—সামনের ক্যালেন্ডারটার দিকে! মুহূর্ত্তে তাহার মন হইতে সমুদয় আনন্দের উন্মেষ বিলীন হইয়া গেল। ক্যালেন্ডারের গায়ে বড় বড় হরফে লেখা রয়েছে ১৬ তারিখ!

—তাইত আমার মনেও হয়নি যে সে-তারিখটা এত কাছে ঘনিয়ে এসেছে! সেই চিঠিখানা মাহেনও ত সরিয়ে নিতে পারে আশ্চর্য কি? সে কি কখনও সম্ভব!

১৪ই তারিখ সকালবেলা মাহেন—যাদুপুরীতে মীরা ও রজতের কাছে আসিল। তাহারা দুইজনে তখন চা পান করিতেছিল। —মাহেনের মুখে বিষাদের চিহ্ন ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

মাহেন বিষণ্ণ সুরে বলিল—মা-পানের অবস্থা ভাল নয়—আজ

আমি এ-বাড়ী থেকে তোমাদের দেখাশুনা করতে পারবো না।
—আমার ঘোড়াকে তোমার জন্য পাঠিয়ে দেব—মীরা।

—রজতের মুখে একটা প্রফুল্ল ভাব ফুটিয়া উঠিল!

রজত বলিল—মিঃ মাহেন, তাহলে আপনি কি আর আসবেন না? আমার মা-পানের জন্য বড় দুঃখ হয়! গোলাপ ফুলের মত মেয়েটি!

—আমি তার কাছেই থাকবো, মাষ্টার রজত আজ রাত্রিতেই চলে যেতে হবে। আমার সইসকে বলে দিয়েছি—যাবার আগে এই সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার সময় ঘোড়াটাকে তোমাদের আস্তাবলে রেখে যাবে!

রজতের মনটা দমিয়া গিয়াছিল। সে মাহেনের সঙ্গে এগিয়ে গেল না, মীরা গেল। রজত জানালার ধারে দাঁড়াইয়া থাকিয়া বাহিরের দিকে উদাস দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

তাহার মনে শুধু এই কথাই জাগিতেছিল তাহাকে কোন্ অন্ধকারের মধ্যে ফেলিয়া রাখিয়া মাহেন চলিয়া যাইবে —কোন্ উদ্দেশে—সে তাহা বুঝিতে পারিল না। সত্য সত্যই কি মাহেনের ভগ্নীর পীড়া বৃদ্ধি পাইয়াছে, না সে অমনি চলিয়া গেল? এ-সমস্যার কে মীমাংসা করিবে?

—সাতাশ—

মাহেনের আবির্ভাব

রজতের মনে হইল মীরার কাছে সব ঘটনা প্রকাশ করাই ভাল। যদি মীরা কোন সন্ধান জানে। পর দিন সকাল বেলা রজত প্রথমেই মীরার ঘরের দরজায় ঘা দিতেই মীরা দরজা খুলিয়া বলিল—রজতদা এত সকালে যে কি খবর, বলত? মাহেনের বোনের কোন সংবাদ পেয়েছ কি? রজত শোবার ঘরের এক কোণের চেয়ারটায় বসিয়া বলিল—না! মীরা বড় আয়নাটার কাছে দাঁড়াইয়া মাথার চুল আঁচড়াইতে আঁচড়াইতে বলিল, তাহলে সত্যি মাহেন সহরে চলে গেছে? তাইত মনে হয়।

মীরা তোমার কাছে আমার অনেক কিছু বলবার আছে। এতদিন ভেবেছিলুম না বলাই ভাল, কিন্তু এখন দেখলাম, বলে ফেলাই ভাল।

মীরা তাহার বিছানার উপর আসিয়া চুপ করিয়া বসিল। প্রভাতের সুন্দর আলো ও বাতাস ঘরখানিকে প্রমোদিত করিয়া তুলিয়াছিল।

মীরা ঘাড় বাঁকাইয়া মৃদু কন্ঠে বলিল: কি বলবে বল রজতদা? তখন রজত লাইব্রেরী ঘরে চিঠিখানি পাওয়া হইতে আগাগোড়া সব কথা বলিয়া গেল।

মীরা গম্ভীর ভাবে বলিল,—আমাকে আগে বললে ভাল হত, হয়ত আমি তোমাকে—

তুমি কিছুই করতে পারতে না—রজত গম্ভীর ভাবে বলিতে লাগিল,—এখন কি যে করতে হবে তা বুঝে উঠতে পারছি না। আমার মনে হয় মাহেন সম্ভবতঃ এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছে।

মীরা বাধা দিয়া বলিল,—আমি বিশ্বাস করতে পারি না। তুমি কি সত্যি মাহেনকে সন্দেহ করো?

মৃদুস্বরে রজত বলিল—বলতে পারি না। তাহার মনে পড়িল ফাদার লগসডেলের কথা। মংবো অতি বিচক্ষণ ব্যক্তি। সে নিজের

স্বার্থের জন্য অর্থলাভের জন্য যে কোন কাজ করতে কখনো কুন্ঠিত হয় না। যদি সে দাদুভাইয়ের উদ্ভাবনীর ভিতরকার কৌশল সব জানতে পারে তবে অসম্ভবকে করে তুলবে সম্ভব, পৃথিবী-জোড়া হবে আবিস্কারের জন্য খ্যাতি।

না—না মাহেন কিছুতেই এসব জানতে পারবে না। দাদামশাই এখন কোথায় আছেন ঠিক জানিনাত, কে দিবে তাঁকে খবর? আচ্ছা, মাহেন ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করলে হয় না? তার সঙ্গে খোলাখুলি ভাবে সব কথা আলাপ করলেইত ভাল হয় কি বল?

রজত দৃঢ় কন্ঠে বলিল—না, না সে হ'তেই পারে না। তবে যদি সহরে গিয়ে খোঁজ নিয়ে আসি, মাহেনের বোন্ কেমন আছে তাহলে বুঝা যাবে সত্যিই মাহেন সহরে গেছে কিনা, যদি সেখানে সে না গিয়ে থাকে তবে বুঝতে হবে তার মনে নিশ্চয়ই কোন কু-মতলব আছে।

এইভাবে রজত ও মীরার মধ্যে অনেক্ষণ পর্যন্ত কি ভাবে কাজ করা যাইবে তার আলাপ-আলোচনা চলিতে লাগিল। তারপর দুইজনে বাগানের মধ্যে বেড়াইতে গেল।

মীরা বলিল—আমি তোমায় বলছি রজতদা, তুমি ঠিক জেনো, আজ রাত্তিরে কিছু হবে না।

তাত বুঝলাম মীরা কিন্তু আমাদের সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে চারদিকে। কে জানে কখন কোন্ পথে মংবোর কোন লোক লাইব্রেরী ঘরে ঢুকে পড়বে। আমরা আজ বাড়ীর বাইরে যাব না। মীরা, আমার কেমন সন্দেহ হচ্ছে, আজ একটা কিছু করবেই এরা। আমরা দু'জনে লাইব্রেরী ঘরের দিকে পাহারা দিব।

সন্ধ্যার পর রজত ও মীরা খাওয়াদাওয়া শেষ করিয়া বারান্দার দিকে আসিতেই দেখিতে পাইল, মাহেন বারান্দার পথ দিয়া লাইব্রেরী ঘরের দিকে যাইতেছে। রজত ও মীরা তাহাকে দেখিতে পাইয়া বিস্মিত হইল এবং সেদিকে ছুটিয়া আসিল। রজত জিজ্ঞাসা করিল,—মিঃ মাহেন, আপনার বোন কেমন আছেন? তাঁর কি অসুখ বেড়েছে? আপনি হঠাৎ এলেন যে!

মাহেন গম্ভীর ভাবে সন্দিগ্ধ চোখে তাহাদের দিকে চাহিয়া

বলিল,—না, সে ঐ একভাবেই আছে। কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে সে তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে উভয়ের দিকে তাকাইল।

মাহেন বলিল—হঠাৎ এসে পড়েছি। তোমাদের বিরক্ত করলুম। কিছু মনে করো না মীরা, মাষ্টার রজত, আমার লাইব্রেরী ঘরে কিছু কাজ করতে হবে।

রজত ও মীরা বিস্ময়ের সহিত মাহেনের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। মাহেন ধীরে ধীরে লাইব্রেরী ঘরের দিকে চলিয়া গেল। রজত ও মীরা উভয়ে খানিকক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

রজত বলিল, দেখলে মীরা আমি যা ভাবছি সত্যি তাই! আঃ দাদুভাইয়ের লোহার আলমারীর চাবি যদি আমাদের কাছে থাকত তাহলে ওর ভিতরকার যা কিছু কাগজপত্তর সব বের করে আনতে পারতুম! কি মুস্কিলই না হল। সে অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িল —মীরাও বড় কম বিস্মিত হয় নাই মাহেনের এইরূপ আকস্মিক আগমনে!

তাহারা বারান্দায় দেখিতে পাইল মিঃ মাহেন লাইব্রেরী ঘরের তালা খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। এক ঘন্টা পর মাহেন লাইব্রেরী ঘর হইতে বাহির হইল এবং বলিল, ধন্যবাদ তোমাদের। আমার ঘোড়া যাদুপুরীর বাইরে ফটকের কাছে বাঁধা আছে। আমাকে আজই আবার সহরে ফিরতে হবে। নেহাৎ জরুরি কাজ ছিল তাই হঠাৎ এসে পড়েছিলাম। এই কথা বলিয়াই ধীর গম্ভীর ভাবে মাহেন যাদুপুরীর বাহিরে চলিয়া গেল এবং একটু পরেই শোনা গেল তাহার ঘোড়ার পায়ের খট্‌খট্‌ শব্দ।

মীরা বলিল—রজতদা, তোমার কথা এখন আমার মিথ্যে বলে মনে হয় না। আচ্ছা এক কাজ করলে হয় না?

কি কাজ?

চল আমরা দু'জনেও মাহেন কোন্‌পথে কোথায় যান তার পিছু পিছু যাই।

রজত মীরার কথায় উল্লসিত হইয়া উঠিল এবং দুইজনে ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া তাহাদের ঘোড়া দু'টিতে চড়িয়া ফটকের বাহিরে আসিল। তাহারা জ্যোৎস্নালোকে দেখিতে পাইল—মাহেন সমুদ্রের ধারের পথ ছাড়িয়া পাহাড়ের একটা উঁচু নীচু বাঁকা পথ ধরিয়াছে

এবং মাঝে মাঝে ঘোড়া দাঁড় করাইয়া ম্বখ ফিরাইয়া এদিক ওদিক লক্ষ্য করিতেছে।

তখন জ্যোৎস্না ড্ববিয়া অন্ধকার হইয়া আসিতেছিল আকাশে কালো মেঘ জমাট বাঁধিয়া আরো বেশী অন্ধকার করিয়া ত্বলিয়াছিল।

দ্ব'জনের ঘোড়া ছ্বটিতেছিল। অজানা পথের মাঝখানে যে-সব শিলারাশি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে পড়িয়াছিল, তাহাদের ঘোড়া মাঝে মাঝে তাহাতে পড়িয়া হোঁচট খাইতেছিল। রজত দ্বইদিকের নিবিড় অরণ্য—নির্জ্জন পথ দেখিয়া ভয় পাইতেছিল। মীরা কিন্তু নির্ভীকভাবে বলিতেছিলঃ কোন ভয় করোনা রজতদা! সহর আর বেশী দ্বর নয়। এক ঘন্টার মধ্যেই পেঁছে যাব।

এমন সময় মাথার উপরের জমাট কালো মেঘের ব্বক হইতে বিদ্যুৎ ঝলসিতে আরম্ভ করিল এবং আরম্ভ হইল প্রবল বৃষ্টি!

— আঠাশ —

বন্দী

সেই অন্ধকার ও ঘন বর্ষণমুখর সন্ধ্যায় তবু দুইজনে পরম উৎসাহের সঙ্গে ঘোড়া ছুটাইয়া চলিল। মীরা এখানে আগেও কয়েকবার আসিয়াছিল—তাহার পরিচিত থাকিলেও ঘন বর্ষার ধারায় চারিদিক ধোঁয়ার মত অস্পষ্ট অন্ধকারে ঢাকিয়া ফেলিয়াছিল, তবু সে তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে চারিদিকে লক্ষ্য করিয়া ঘোড়া ছুটাইয়া দিল। দুই দিকে বৃক্ষের সারি দৈত্যের মত মাথা উঁচু করিয়া পথ রোধ করিয়াছিল। মীরা সচকিত কন্ঠে বলিল:—রজতদা! তোমাকে সহরে পেঁাছবার ওই মোড়ের পথটা দেখিয়ে দিয়ে আমি বাড়ী ফিরে যাব! একথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই ছোট্ট পাহাড়ের পথে চলিতে অভ্যস্ত তাহার ঘোড়াটি পাহাড়ের গা হইতে যে জলস্রোত দ্রুতবেগে নামিয়া আসিতেছিল সেই স্রোতে পথের উপর যে-সকল ছোটবড় শিলাখন্ডগুলি গড়াইয়া আসিতেছিল, তাহার একটিতে হুঁচোট খাইয়া পড়িয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে মীরাও মাটিতে পড়িয়া গেল। সৌভাগ্যক্রমে সে তেমন চোট পায় নাই। রজত সেই পড়ার শব্দে শঙ্কিত হইয়া পেছন ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল—মীরা উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহার সর্ব্বাঙ্গ বৃষ্টির জলে ভিজিয়া গিয়াছে, কাপড়ে কাদা লাগিয়াছে—মীরা একেবারে স্তম্ভিতের মত দাঁড়াইয়া আছে। রজত তাড়াতাড়ি ঘোড়া হইতে নামিয়া পড়িল এবং তাহার কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—তোমার কি বড় লেগেছে মীরা!

মীরা সেখানে সে-অবস্থায় দাঁড়াইয়াও হাসিমুখে কহিল,—না, ভাই, রজতদা তেমন কিছু লাগে নাই। মীরা যেখানে হুঁচোট খাইয়া পড়িয়াছিল, তাহার অল্প একটু দূরে একখানি পাথরের তৈরী ছোট ঘর ছিল। দিনের বেলা সেখানে পথচারীদের জন্য একজন বর্মী দোকান করে—চুরুট, পান, চা, বিস্কুট এই সব সে বিক্রী করে। রজত

মীরাকে সেখানে সন্তর্পণে হাত ধরিয়া লইয়া চলিল এবং তাহাকে সেখানে বসাইয়া রাখিয়া—মীরার ঘোড়াটার অবস্থা কি হইয়াছে তাহা দেখিবার জন্য ঘোড়ার কাছে গিয়া দেখিল, ঘোড়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহার নিজের ঘোড়াটা ও মীরার ঘোড়াটাকে লইয়া রজত যেমন ঐ ছোট পাথরের ঘরের দিকে যাইতেছিল, এমন সময় সম্মুখের দিক হইতে একজন লোক অতি দ্রুত ঘোড়ায় চড়িয়া আসিতেছে দেখা গেল। বৃষ্টি তখন অনেক ধরিয়া আসিয়াছিল। ঘোড়ার পায়ের শব্দে সম্মুখের দিকে চাহিবামাত্র—রজত দেখিতে পাইল, সে অশ্বারোহী আর কেহই নহেন,—মিঃ মাহেন।

রজতের মনে একটা ভয় ও আতঙ্কের সৃষ্টি হইল, তবে—তবে—মাহেন তার কাজ শেষ করিয়া বাড়ী যাইতেছে। মংবুর অফিসে নিশ্চয়ই মাহেনের সঙ্গে তাহার দেখা হইয়াছে এবং তাহার দাদা-মশাইয়ের গবেষণার নূতন আবিষ্কারের খবরাখবর সব প্রকাশ করিয়া দিয়াছে। সে একান্ত নিরুপায় হইয়া পড়িল, তবে তার এত চেষ্টা ও যত্ন সবই কি বৃথা হইবে! কি সে করিতে পারে?

এমন সময় মিঃ মাহেন তাহার অশ্বের রশ্মি সংযত করিয়া একেবারে রজতের মুখোমুখি আসিয়া দাঁড়াইল এবং রজতের দিকে তীক্ষ্ন-দৃষ্টিতে তাকাইয়া প্রশ্ন করিল—কে মাষ্টার রজত না?

হাঁ, মিঃ মাহেন।

এমন অসময়ে কোথায় যাওয়া হচ্ছিল শুনি? —মাহেনের কন্ঠস্বরের মধ্য দিয়া একটা বিরক্তির ভাব প্রকাশ পাইতেছিল—পূর্বে কোনদিন মাহেন এমন ভাবে তাহার সহিত কোন কথা বলেন নাই। রজত একটু ক্ষুব্ধ হইল—উত্তর করিল, আমি আর মীরা এ-পথে ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে এসেছিলুম, পথে বৃষ্টির জন্য এগুতে পারিনি। তারপর মীরার ঘোড়াটা হুঁচোট খেয়ে পড়ে যাওয়ায় আর যাওয়া হয় নি।

মাহেন কহিল, মীরা কোথায় আছে?

রজত অঙ্গুলি তুলিয়া ছোট পাথরের ঘরটি দেখাইয়া দিল এবং মাহেনকে বলিল—আপনার সঙ্গে মীরাকে নিয়ে যান, আমি দেখেছি, ঘোড়াটার তেমন কিছু হয় নি। আমি পরে আসছি।

মাহেন ঘোড়া হইতে নামিয়া আসিলেন এবং মীরার কাছে গিয়া

বলিলেন—মীরা কাজটা একেবারেই ভাল করোনি, এই দুষ্ট ছেলেটার সঙ্গে থেকে তুমিও দুষ্ট হয়ে যাচ্ছ। এখন উঠে এস, দেখছো, আবার আকাশে মেঘ জমে চারিদিক অন্ধকার হয়ে আসছে। তারপর আবার রজতের দিকে চাহিয়া রূঢ়ভাবে বলিলেন—দেখ, মাষ্টার রজত তোমাকে ভাল করে শাসন করতে হবে। খবরদার ভবিষ্যতে যেন তোমাকে এমন কোন অন্যায় কাজ করতে দেখতে না পাই।

মীরা একটি কথাও বলিল না। সে ধীরে ধীরে—তাহার ঘোড়ার উপর গিয়া উঠিল। মিঃ মাহেন অতি সন্তর্পণে তাহাকে সাহায্য করিল। অল্প সময়ের মধ্যে মীরা ও মাহেন রাস্তার বাঁকে অদৃশ্য হইয়া গেল।

তাহারা দুইজন চলিয়া গেলে রজত ঠিক করিল, সে কিছুতেই থিবো সহরে মিঃ মংবুর অফিসে না গিয়া বাড়ী ফিরিবে না। তাহার দাদামশাইয়ের বিরুদ্ধে এই যে ষড়যন্ত্র, এই অন্যায় ষড়যন্ত্রকে সে কিছুতেই সফলকাম হইতে দিবে না। সে যখন গোপন রহস্য জানিতে পারিয়াছে তখন তাহার প্রতিকার করা চাই—ই চাই।

—রজত আর কালবিলম্ব না করিয়া সহরের দিকে চলিল। রাস্তার বাঁয়ে মোড়টা ফিরিতেই অদূরে সহরের দৃশ্য তাহার চোখের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিল। তখনও বৃষ্টি পড়িতেছিল। দুই একটি রাস্তার মোড় ফিরিতেই সে মংবুর অফিস বাড়ীটির কাছে আসিয়া পৌঁছিল। রাত্রি তখন বেশী হয় নাই, তবু ছোট সহরটির বুকে কে যেন মায়া-কাজল বুলাইয়া দিয়াছে। সহরটি নিস্তব্ধ। একবার সে পাদ্রী লগস্‌ডেল সাহেবের সঙ্গে থিবো সহরে বেড়াইতে আসিবার সময় এ-বাড়ীটি দেখিয়া আসিয়াছিল।

সুদৃশ্য সুন্দর বাড়ী। বাড়ীর ফটকের কাছে আসিয়া অল্প দূরে একটা গাছের সঙ্গে ঘোড়াটিকে বাঁধিয়া রজত ধীরে ধীরে অফিসের ফটকের কাছে আসিল। ফটকটি বন্ধ থাকিলেও সে সহজেই দেয়াল টপকাইয়া অফিস বাড়ীর হাতার মধ্যে প্রবেশ করিল। কেহ কোথাও নাই। বাহিরের আঙ্গিনা হইতে ঘরে প্রবেশ করিবার দরজায় মজবুত তালা লাগান। বাড়ীর এদিক ওদিক ঘুরিয়া দেখিতে পাইল—উপরের এক পাশের একটি ছোট ঘর হইতে ক্ষীণ আলোক-রশ্মি বাহিরে আসিয়া পড়িয়াছে। হয়ত বা কোন লোক ঐ ঘরে থাকিতে

পারে। মিঃ মংবু সন্ধ্যার পর অফিস হইতে চলিয়া যান কাজেই কোন পাহারাওয়ালা হয়ত সেখানে আছে।

কোনদিক দিয়াই বাড়ীতে ঢুকিবার পথ সে পাইল না। এদিক ওদিক ঘুরিতে ঘুরিতে সে দেখিতে পাইল—নীচে পশ্চিম দিকে একটা বড় জানালা আছে। হাত দিয়া উহা খুলিতে চেষ্টা করিয়াও তাহা পারিল না। পকেট হইতে তাহার ছুরিখানা বাহির করিয়া কৌশলের সহিত জানালার কপাটটা ফাঁক করিয়া ভিতরকার



একজন লোক টর্চের আলো তাহার মুখের উপর ফেলিল

ছিটকানিটা সহজেই খুলিতে পারিল। রজত আনন্দে অধীর হইল। কেননা ঐ জানালার গায়ে লোহার কোন গরাদ ছিল না। সে তড়িৎ-পদে জানালার ভিতর দিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। কক্ষটি বেশ বড়। রাস্তার আলোকস্তম্ভ হইতে বিকীর্ণ ক্ষীণ আলোকে সে দেখিতে পাইল ঐ ঘরটির মাঝখানে বড় একটা টেবিল। টেবিলের উপর অতি সুন্দরভাবে সজ্জিত অফিসের সাজ-সরঞ্জাম। উহার উপর একটা মোটা রকমের বড় খাম পড়িয়াছিল, সে সেই খামটি তুলিয়া পকেটে পুরিল। সেই ঘরের দরজা খুলিতেই সম্মুখে সে উপরে উঠিবার সিঁড়ি পাইল। সিঁড়ি দিয়া অতি সন্তর্পণের সঙ্গে সে উপরে উঠিতে লাগিল। উপরে উঠিবার সময় পাশের একটা কুলুঙ্গির মধ্যে কয়েকখানি মোটা বই দেখিতে পাইয়া চিঠিখানি তাহার মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়া উপরে উঠিল। উপরে উঠিয়া দেখিতে পাইল দুইপাশে দুইটি ঘর। দুই দিকের ঘরের একটি দরজা খোলা। রজত নিশ্চিন্ত মনে যে ঘরের দরজাটি খোলা ছিল সেই ঘরে ঢুকিয়া পড়িল। এ-ঘরেও অফিসের প্রয়োজনীয় নানা আসবাবপত্র এবং ব্যবসায় সংক্রান্ত অনেক জিনিষ ছিল সুসজ্জিত। সে চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িয়া ক্ষীণ আলোর মধ্যে টেবিলের এক একটি জিনিষ-পত্র নাড়াচাড়া করিতেছিল- রজত তাহার অবস্থাটা যে কিরূপ ভয়াবহ তাহা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছিল।

সে টেবিলের উপর ঐসব কাগজপত্রের মধ্যে কি আছে বা না আছে তাহা সে জানিত না। কাজেই তাহার একটিও সে লইল না। এমন সময় সে দেখিতে পাইল একজন লোক টর্চ্চের আলো তাহার মুখের উপর ফেলিয়া একেবারে তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। লোকটি আর কেহই নহেন, স্বয়ং মিঃ মংবু।

মিঃ মংবু বিকটভাবে হা—হা করিয়া অট্টহাস্য করিয়া কহিলেন—"মাষ্টার রজত! তাইত এই রাত্তির বেলা কি মনে করে এখানে শুভাগমন হয়েছে শুনতে পারি কি?

রজত কোন কথা বলিল না। তাহার কন্ঠরুদ্ধ হইয়া আসিয়াছিল।

মিঃ মংবু বিকট স্বরে বলিলেন—কোন ভদ্রলোককে না বলে বাড়ীতে ঢুকলে পরে তাকে ভদ্রলোকের ভাষায় কি বলে।

রজত লজ্জায় মাথা নীচ্ু করিয়া রহিল।

মিঃ মংব্ু বলিতে লাগিলেন এখন যদি তোমাকে আমি প্ুলিশে দিই তবে কি বলতে পারবে জিজ্ঞাসা করি? কি মতলবে এসেছিলে বলো? কি আছে তোমার পকেটে? দেখতে পারি কি?

রজত এ-সময়ের মধ্যে তাহার মন স্থির করিয়া ফেলিয়াছিল—সে দ্ঢ়কন্ঠে বলিল, আমি কোন ক্ুমতলবে আসিনি। সহরে একবার বেড়িয়ে যাব ভেবে এসেছিলাম, তারপর মনে হল আপনার অফিসের কথা ভাবলাম, আপনি এখানে আছেন কিনা, তার খোঁজটা—

মংব্ু উচ্চ হাস্য করিয়া বলিলেন—সাধ্ু বালক! তোমার দাদা-মশাই মিঃ গ্ুপ্ত আমার পরম শত্র্ু, ত্ুমি তার নাতি, আমার পরম বন্ধ্ু হবে একথা ত আমি মনে করতে পারি না। নিশ্চয়ই তোমার কোন দ্ুরভিসন্ধি আছে। তোমার পকেটে কি আছে, সব বের কর।

রজত তাহার পকেট হইতে সম্ুদয় কাগজ বাহির করিল। মিঃ মংব্ু সম্ুদয় কাগজপত্র খ্ুটিনাটি করিয়া পরীক্ষা করিয়া রজতকে সব ফিরাইয়া দিল। দিলনা শ্ুধ্ু তার ছ্ুরিটি। তারপর গম্ভীর ভাবে বলিল—শত্র্ু সে ছোট হ'ক আর বড় হ'ক তাকে উপেক্ষা করা উচিত নয়—ত্ুমি আজ রাত্রির মত এঘরে বন্দী থাকবে। তারপর নিজের পকেট ঘড়িটি বাহির করিয়া বলিল—না আর সময় নেই—আমার যেতে হবে, গাড়ীর আর বেশী দেরী নেই—হাঁ, ত্ুমি যখন দয়া করে এসেছ, তখন আজ আমার এখানে বাস কর—হাঁ কাল দেখা হবে। তারপর তোমাকে প্ুলিশের হাতে দিব কিনা তা ভেবে দেখা যাবে।

নিজের হাতে সম্ুদয় জানালা বন্ধ করিয়া দিয়া মিঃ মংব্ু বাহির হইলেন এবং খানিকপরেই তাহার ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া তালা লাগাইয়া দিলেন।

বন্দী রজত চ্ুপ করিয়া চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িল।

—ঊনত্রিশ-

মুক্তির সন্ধানে

বন্দী রজত সেই নির্জ্জন ঘরে বন্দী হইয়া একেবারে নিরাশ হইয়া পড়িয়াছিল, সে কেন এখানে আসিল, ব্রহ্মদেশে আসিবার কি এই ফল হইল। যে সে চোর নামে অপরাধী। মুক্তি—মুক্তি চাই কাল সকালে যদি তাকে পুলিশের হাতে দেওয়া হয় তাহা হইলে সে কি আর কাহারো কাছে মুখ দেখাইতে পারিবে? কি অপমানের কথাই না হইবে—মিঃ মাহেন মীরা তার বাবা মার কাছেওত আর সংবাদটা গোপন থাকিবে না। তখন সে—চিরদিনের জন্য সকলের কাছে সে হইবে লাঞ্ছিত!

রজত মুক্তির জন্য ব্যাকুল হইল। রাত্রি তখন ও বেশী হয় নাই দশটা বাজিয়া গিয়াছে, বাহিরে তেমনি বর্ষা নামিয়াছে। জানালার কাচের মধ্য দিয়া পথের আলোতে সে দেখিতে পাইল ঘোড়াটা মাঝে মাঝে চীৎকার করিতেছে, পা নাড়িতেছে—বন্ধন মুক্তির জন্য প্রয়াসও তার বড় কম নয়!

চুপ করিয়া অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকিবার মত ছেলে রজত নয়,—খানিক পরেই সে উঠিয়া বসিল এবং ঘরের এপাশ ওপাশ ঘুরিয়া—কিভাবে বাহির হওয়া যায় তাহারই লক্ষ্য করিতেছিল। সে দেখিল ঘরের পশ্চিম দিকের জানালার গায়ে লোহার গারদ নাই, কিন্তু জানালাটি এত ছোট, তাহার উপরের দুই একখানি বেড়ার কাঠ ভাঙ্গিয়া না ফেলিলে উহার মধ্য দিয়া বাহির হইয়া আসিবার জো নাই অথচ তাহাকে মুক্তিলাভ করিতেই হইবে। তাহার আগে ঘরের সমুদয় কাগজপত্র ও কাগজখানা সে আসিবার সময় লুকাইয়া রাখিয়া আসিয়াছে, সেখানা লইতে হইবে আর যদি কোন কাগজপত্র সে পায় তাহাও সংগ্রহ করিতে হইবেই—সে যেমন করিয়া পারে দাদুভাইকে বিপন্মুক্ত করিবেই।

রজত এইরূপ মনে করিয়া অতি সন্তর্পণে আলমারি, দেরাজ ও

দেখিয়া একস্থানে বড় একটা লেফাপা পাইল—তাহার উপরে নীল পেন্সিলে লেখা আছে—Mr. Gupta's Invention. সেই স্বল্পান্ধকারেও রজত একথা কয়টি পড়িয়া ফেলিল। উহা পড়িয়া রজতের চক্ষু দুইটি আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে উৎসাহের সহিত অন্যান্য স্থানের দেরাজ ও আলমারির কাগজ পত্র উল্টাইয়া পাল্টাইয়া সযত্নে সেই কাগজখানা তাহার ভিতরকার পকেটে পুরিল। তারপর ঘরের এদিক ওদিক ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিতে পাইল যে ঘরের ভিতরকার দিকে সিঁড়ির পাশের উপর দিকে একটি জানালার মত খোলা যায়গা আছে, বোধহয় ঘরের ভিতর আলো ও বাতাস প্রবেশ করিবার জন্যই ঐরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। অকূল সমুদ্রে কূল পাওয়ার মত সে ঐ ফোকরটা দেখিতে পাইয়া ধীরে ধীরে জানালা ও দরজার কপাটের সাহায্যে সেই ফোকরের উপর উঠিয়া সেখান হইতে নামিয়া চুপিচুপি—সিঁড়ির মধ্যে নামিয়া পড়িল—দেখিল সব দরজাগুলি তালা বন্ধ। কেহ কোথাও নাই—এই সুযোগে সে সিঁড়ির পাশে কুলুঙ্গির ভিতর যে খামখানি রাখিয়াছিল সেখানা তুলিয়া লইয়া বাহিরে যাইবার দরজার কাছে আসিল। এই দরজা ভিতর হইতে ছিল যেমন বন্ধ, বাহিরেও ছিল তেমনি তালা দেওয়া—কিন্তু এ-পথে সে বাহিরে যাইবার সুযোগ পাইল—পাশের ঘরের দরজা দিয়া সৌভাগ্যক্রমে সে সেই দরজাটির হুড়কা খুলিবা মাত্রই বাহিরে আসিয়া পড়িল। তখন রাত্রি প্রায় এগারোটা হইয়াছে। লোকজন কেহ কোথাও নাই। বৃষ্টি ও ঝড়ের মাতামাতি আরম্ভ হইয়াছে, বজ্রের ভীম গর্জ্জনে পৃথিবী যেন ভয়েও বিস্ময়ে কাঁপিয়া উঠিতেছে। এইত সময়! মুক্তির আনন্দে তাহার হৃদয় নাচিয়া উঠিল।

—সে ঘোড়ার কাছে আসিয়া তাহার পিঠ চাপড়াইয়া তাহার উপর চড়িয়া বসিল এবং ঘোড়া বৃষ্টির জলে ভিজিয়া তাহার অবসন্ন দেহটাকে সজীব করিবার জন্যই যেন ছুটিয়া চলিল পক্ষীরাজ ঘোড়ারই মত।

রজত যখন অতিশয় শ্রান্ত ও ক্লান্ত দেহে যাদুপুরীতে ফিরিয়া আসিল, তখন তাহার শরীর ও পোষাক বৃষ্টির জলে ভিজায় তাহাকে দেখাইতেছিল যেন সে স্নান করিয়া উঠিয়াছে। তাহার ঘর হইতে সে

জামা কাপড় বদলাইয়া পরিচ্ছন্ন বেশে যখন খাবার ঘরে আসিল, তখন রজত দেখিতে পাইল মিঃ মাহেন চেয়ারে বসিয়া দুই হাত দিয়া মাথা ধরিয়া বিমর্ষ চিত্তে বসিয়া আছে।

রজত জিজ্ঞাসা করিল—মিঃ মাহেন, মীরা কেমন আছে? তাহার আঘাত কি খুব গুরুতর হয়েছিল?

মাহেন কহিল, সে তার ঘরে শুয়ে আছে। আপনাকে আসা মাত্রই তার সঙ্গে দেখা করতে বলেছে। তার আঘাত তেমন গুরুতর হয় নি—কতকটা কেটে গেছে ও ছড়ে গেছে মাত্র। আপনি উপরে যান মাষ্টার রজত, সে যদি ঘুমিয়ে না থাকে তবে তার সঙ্গে দেখা হবে—ঈশ্বর রক্ষা করেছেন, আঘাত অতি গুরুতর হতেও পারত!

রজত বলিল: কিছু মনে করবেন না মিঃ মাহেন, আমি ত বৃষ্টির জলে একেবারে নেয়ে এসেছি, বাড়ী এসে গরম জলে স্নান করে—কাপড় বদলে তবে একটু সুস্থ হয়েছি!

মীরা বলেছে—দোষ তার, আপনার নয়, সেই আপনাকে সঙ্গে নিয়ে ঘোড়ায় চড়া বিদ্যায় তার কতটা শিক্ষা হয়েছে তার পরখ করবার জন্য সহরের দিকে নিয়ে গিয়েছিল। রাস্তাটা যে এত খারাপ তা সে মনে করেনি। এখন সে নিরাপদে বাড়ী ফিরে এসেছে, তাতেই নিশ্চিন্ত হয়েছি। আপনার দাদামশাই এসে পৌঁছলেইত আমার দায়িত্ব আর থাকবে না। —মিঃ মাহেনের কথার সুরে কোনরূপ কঠোরতার লেশমাত্রও ছিল না। হাঁ, আমার আবার এক্ষুনি সহরে ফিরে যেতে হবে—এইবার খাওয়া দাওয়া সেরে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ুন—রাতও হয়েছে আর আপনাকে খুব শ্রান্ত ও ক্লান্ত দেখাচ্ছে!

রজত উপরে চলিয়া গেল। সে যখন মীরার ঘরে আসিল, তখন দেখিতে পাইল—মীরা তাহার বিছানাতে বসিয়া আছে, তাহার পাশের ছোট টেবিলটির উপর একটি মোমবাতি জ্বলিতেছে।

মীরা রজতকে দেখিতে পাইয়া সোল্লাসে চীৎকার করিয়া কহিলঃ উঃ কি বিপদেই না পড়েছিলুম। মিঃ মাহেন ও আমি বাড়ী ফিরে আসবার পর কি হয়েছিল বলত?

হাঁ, তোমাকে বলছি মীরা, একথা বলিয়া সে মীরার বিছানার এক পাশে বসিয়া সংক্ষেপে সব কথা আগাগোড়া বলিয়া—কহিল—বুঝেছ

মীরা, মিঃ মাহেন ব্ঝতে পেরেছেন যে তাঁর ষড়যন্ত্র আমাদের অজানা নেই।

এখন কি করবে ভেবেছ?

আমি আজ কি যে করবো, সে-সম্বন্ধে কোন কথাই ভেবে দেখিনি, মীরা ধীর কন্ঠে কহিল—আমার মনে হয় কাল সকালে ফাদার লগস্ডেল সাহেবকে সব কথা জানিয়ে তার পরামর্শ নিয়ে কাজ করা ভাল হবে। আচ্ছা মিঃ মাহেন কি তোমায় আর কিছ্ মন্দ বলেছেন?

না, আমার সঙ্গে বেশ মিষ্টি ব্যবহার করেছেন এবং সাবধান করে দিয়েছেন ভবিষ্যতে এমন দ্ঃসাহসিক এ্যাডভেঞ্চার যাতে না করি! মীরার কথায় প্রফ্ল্ল হইয়া রজত বলিল—এখন ঘ্মিয়ে ক্লান্তি দ্র করিগে। কাল সকালে উঠে ভেবেচিন্তে যা হয় ঠিক করে ফেলবো।

রজত আপনার ঘরে আসিয়া শ্ইয়া পড়িল। খানিকটা সময় তার বেশ ঘ্ম হইল। হঠাৎ কিসের যেন একটা শব্দে তাহার ঘ্ম ভাঙ্গিয়া গেল। সে অন্ভব করিল—কে যেন অতি সন্তর্পণে দীর্ঘ বারান্দার পথ ধরিয়া চলিয়াছে। রজত বিছানায় উঠিয়া বসিল, এবং মনে মনে বলিল, না আর ও লোকটার পিছ্ ধাওয়া করবো না, যা ইচ্ছে কর্ক সে। একথা বলিয়া সে শ্ইয়া পড়িল এবং খানিকক্ষণ চক্ষ্ ব্জিয়া রহিল, তারপর তার অন্সন্ধিৎস্ মন আবার রহস্যোদ্ঘাটনের জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিল, সে তাড়াতাড়ি চটিজ্তা পায়ে বিছানা ছাড়িয়া দরজার বাহিরে আসিল। যেই হউক সে যে সিঁড়ি বাহিয়া নীচে নামিয়া গিয়াছে তাহা ব্ঝিতে তাহার কোন সন্দেহ রহিল না।

রজত নীচে নামিয়া আসিয়া দেখিল—লাইব্রেরী ঘরের দরজা খোলা। একটী উজ্জ্বল আলোর তীব্র দীপ্তি বারান্দার এক দিকে আসিয়া পড়ায়, সে-দিকটা উজ্জ্বল হইয়াছে—ঘরের মধ্যে কাহাকেও দেখা গেল না শ্ধ্ ভিতরকার টেবিলটা একদিকে সরান আর গ্প্ত-পথের দরজার আবরণটা খোলা।

রজত নিজের মনে খানিক হাসিয়া লাইব্রেরী ঘরের দরজাটা বন্ধ করিয়া দিল এবং আপনার মনে একটা চেয়ারের উপর ঠেসান দিয়া বসিয়া শিস্ দিতে লাগিল। তাহার হাতে ছিল না কোন অস্ত্র,

এইরূপ নিরস্ত্রভাবে চোর--দস্যুর পিছু ছোটা যে কোন রকমেই নিরাপদ নয় রজত সেকথা ভাবেও নাই। সে মনে মনে ভাবিতে লাগিল আমি কখনই অই সুড়ঙ্গপথে নীচে নামবোনা—যিনি নীচে গেছেন তাঁকেও আবার এ-পথেই বের হয়ে আসতে হবে, দেখা যাক না কোন্ মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়েছে!

রজতের বেশীক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইল না। মনে হইল কে যেন দড়ির সিঁড়িটা দিয়া উপরে উঠিতেছে। ক্রমে সুড়ঙ্গের মুখে দেখা গেল একটি মাথা, তারপর ধীরে ধীরে একটি লোক উপরে উঠিয়া আসিল, প্রথমে রজতের দিকে ছিল তাহার পিছনটা কিন্তু লোকটি যখন রজতের দিকে মুখ ফিরাইয়া সামনাসামনি দাঁড়াইল—তখন রজত বিস্মিত হইয়া দেখিল এই সেই বৃদ্ধ লোকটি যাহার সঙ্গে হাওড়া ষ্টেশন হইতে বোম্বে আসিবার সময় তাহার দেখা হইয়াছিল।

রজত বিস্মিত হইয়া দেখিল—সেদিন যেমন বৃদ্ধের কালো রঙের সুট পরা ছিল—এখনও সেই সুটটি পরা, মুখখানি তেমনি রহস্যময় এবং মুখে হাসিটি লাগিয়া আছে।

—ত্রিশ—

কে ধরা পড়িল?

দু'জনে যখন মুখোমুখি হইয়া দাঁড়াইল, তখন বৃদ্ধ রজতকে জিজ্ঞাসা করিল: হাঁহে রজত, তোমার কি রাত্রে ঘুম হয় না? এ-সময়ে ধরা পড়বার কোন আশঙ্কা নেই মনে করে আমি বেরিয়ে পড়ি: কোথাকার দুষ্ট ছেলে তুমি, একবার ধরা পড়তে গিয়ে বেঁচে গিয়েছিলাম, এবার আর রক্ষা পেলাম না!

রজত ক্রুদ্ধস্বরে কহিল—জানিনা কে আপনি? আপনি যেই হোন রাত্রিবেলা আমার দাদুভাইয়ের বাড়ীতে এ-ভাবে চলাফেরাটা যে সাধু মহাজনের কাজ নয় তা বেশ জানেন! আপনার মতলবটা কি বলুনত?

বৃদ্ধ রজতের দিকে চাহিয়া মনে মনে বলিলেন—সেই স্বভাব! বৃদ্ধ হাসিয়া বলিলেন, ওহে ছোকরা তোমার হাতেও রিভলবার নেই, আমার হাতেও একটা রিভলবার নেই, তাহলে বেশ হোত না? তুমি বলতে "Hand's up or I Shoot"—বলিয়াই বৃদ্ধ হাসিতে লাগিল।

রজত বিস্মিত হইল বৃদ্ধের এই পরিহাসে, তার এ কি স্বভাব! হাতের কাছে পাইয়া কি অপরাধীকে ছাড়া যায়? সে বৃদ্ধের উপহাসে বিন্দুমাত্রও বিচলিত না হইয়া বলিল—আপনি আমার কথার জবাব দিন কেন আপনি এখানে এসেছিলেন? রজত তাহার একটি হাত দিয়া দরজার কপাটটা শক্ত করিয়া চাপিয়া ধরিয়াছিল।

যদি আমি না বলি! —বৃদ্ধ বিরক্ত হইয়া বলিল, রাত ঢের হয়েছে। এখন ঘুম পেয়েছে, হাঁ তোমার চোখ দেখে মনে হচ্ছে, তোমারও খুব ঘুম পেয়েছে কি বল?

রজত দৃঢ়কন্ঠে বলিল,—যদি না বলেন, তবে আপনাকে এঘরে বন্দী করে রেখে দিয়ে কোন লোককে পুলিশ ডাকতে পাঠিয়ে দিব।

বৃদ্ধ তেমনি মধুর ভাবে হাসিয়া বলিলেন, আমি জানি তুমি তা করবে না। আমার কিন্তু পুলিশের হাতে পড়তে মোটেই সাধ নেই। তোমাকে দেখে মনে হয় তুমি বেশ সাহসী ও চতুর ছেলে। তুমি কি মনে কর আমাকে পুলিশের হাতে দিয়ে বুদ্ধিমানের কাজ করবে? তারপর হা—হা করিয়া উচ্চ হাস্য করিয়া বলিলেন—আমি কে জান?

রজত বিদ্রুপের সঙ্গে কহিল,: কোন চোর ডাকাতের সঙ্গেত কোনদিন আমার পরিচয় ছিল না, কাজেই আপনাকে কি করে চিনবো বলুন!



আমি কে জান? আমার নাম করুণাশঙ্কর গুপ্ত

বৃদ্ধ রহস্য করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন—পারলে না? কেমন! তবে শোন, আমার নাম করুণাশংকর গুপ্ত!

রজত অপূর্ব বিস্ময়ে বৃদ্ধের মুখের দিকে চাহিয়া কহিল—না-না কখখনো আপনি আমার দাদুভাই হতে পারেন না।

বৃদ্ধ গম্ভীর কন্ঠে দৃঢ়স্বরে বলিলেন—হাঁ, আমিই তোমার দাদামশাই—তোমার দাদুভাই। আমারই নাম করুণাশংকর গুপ্ত। তারপর মিঃ গুপ্ত রজতের কাছে আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া আনিয়া একখানি চেয়ারে বসাইয়া বলিলেন—কেন, রজত আমার কথায় তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না?

রজত অবাক হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বিস্মিত হইয়া কহিল—আমিত তোমার পরিচয় জানতুম না দাদুভাই! তারপর তাঁহার পদস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলে পর বৃদ্ধ তাহাকে পরম স্নেহে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন: তোমার কোন দোষ নেই ভাই। তোমাকে প্রথম যেদিন গাড়ীতে দেখেছিলাম, সেদিনই তোমাকে চিনেছিলাম, তুমি আমাকে চিনতে পারোনি, কি করেই বা চিনবে! সে অতি ছেলেবেলা একবার এদেশে এসেছিলে, আমি কুড়ি বছরের ভিতর কোন ফোটোগ্রাফ ও তুলিনি যে বাবা মার কাছে দেখতে পাবে! অনেক রাত হয়েছে, আমাদের কথাবার্ত্তায় বাড়ীর লোকজন সব জেগে উঠবে কাল সকাল বেলা চা খাবার পরে তুমি যা কিছু জানতে চাও তোমাকে বলবো! হাঁ একটা কথা—আমি এর মধ্যে দু'বার এবাড়ী এসে মীরা কেমন আছে খোঁজ নিয়ে গিয়েছি, মিঃ মাহেনের পত্রে তার বোনের কঠিন ব্যারামের কথা শুনেও একবার এসেছিলাম, যদি বিপদের সময় তার কোন উপকার করতে পারি। তুমি ও মীরা যখন কাল দু'জন সহরের দিকে যাচ্ছিলে সে সময়ে আমি এসেছি। প্রথমেই আমি আমার শোবার ঘরে যাই, সেখানে আমার সব গুছানো থাকে। এবার আমি শোবার ঘরে না গিয়ে বরাবর এই সুড়ঙ্গ-পথে চলে গিয়েছিলাম—গোলাপবাগের ঘরের দিকে দেখতে যে আমার আবিষ্কারের নূতন তথ্যযুক্ত কাগজ-পত্র সব ঠিক আছে কি না! তুমি বোধ হয় আমার কথার মর্ম্ম এখন বেশ বুঝতে পেরেছ।

রজতের মনের ভিতর এ-সব কথা শুনিতে শুনিতে যেন একটি ঘুর্ণিপাক খেলিয়া গেল।

বৃদ্ধ বলিতে লাগিলেন—আমি মীরাকে বলেছিলাম তোমাকে সব জানাতে। তুমি বোধহয় জানতে পেরেছ মিঃ মংবু আমার এই আবিষ্কারের সব গোপন কাগজপত্র হাত করতে চান, জানিনা মিঃ মাহেন সে-সব কোন নিরাপদ যায়গায় রেখেছেন কিনা। তুমি কি এ-বিষয়ে কিছু জান?

আমি জানি দাদুভাই কোথায় আছে সে-সব—রজত অতি মৃদুকন্ঠে একথা কয়টি বলিল। কোন দুশ্চিন্তা করবেন না দাদামশাই,—আমার ঘরে, উপরে নিরাপদে আছে সব আনবো কি? না, কোন দরকার নেই এখন। মিঃ মংবুর হাতে এসব পড়ে, তাত তুমি নিশ্চয়ই ইচ্ছা কবো না। রজতের মুখ দিয়া বাহির হইতেছিল 'না'—কিন্তু আপনাকে সংযত করিয়া সে নীরব রহিল। খানিক পরে সে একটিও কথা না বলিয়া উপরে চলিয়া গেল এবং তাহার দেরাজের ড্রয়ারের ভিতর হইতে সেই খামখানি বাহির করিল এবং খামের ভিতর যে পার্চমেন্ট কাগজ ছিল তাহা বাহির করিয়া—পড়িয়া ফেলিল এবং বাকী কাগজটুকু খামে পূর্বের মত ভরিয়া আনিয়া বৃদ্ধের হাতে দিল। বৃদ্ধ কোন কথা না বলিয়া এবং খামখানি না খুলিয়া পকেটে পুরিলেন! তারপর রজতের দিকে চাহিয়া মৃদুহাস্য করিয়া বলিলেন,—তুমি কাকে রক্ষা করতে চাইছ, বুঝতে পাচ্ছি। আচ্ছা আজকের মত আলোচনা বন্ধ থাক। এস দু'জনেই শুতে যাই—কাল সকালে এ-বিষয়ে মাথা ঘামানো যাবে। রজত ও মিঃ গুপ্ত উভয়ে নিজ নিজ শোবার ঘরে চলিয়া গেলেন।

সে-দিন রাত্রিতে তাহাদের কাহারো ঘুম হয় নাই—উভয়ের দেহে একই রক্তের ধারা বহিতেছিল।

চায়ের টেবিলে বসিয়া রজত ও মীরাতে কথা হইতেছিল। সেদিন মীরাকে বেশ সজীব ও প্রফুল্ল দেখাইতেছিল।

রজত বলিল, জান মীরা, দাদুভাই বাড়ী ফিরে এসেছেন। তারপর সে মীরার কাছে একে একে সব কথা বলিতে লাগিল। মীরা অসহিষ্ণুভাবে সব কথা শুনিল। পরে রজতের দিকে চাহিয়া বলিল—তোমার চেয়ে আমি ঢের বেশী জানি দাদুভাইয়ের স্বভাব,

তিনি যে জিনিষটা জানতে চান, সে বিষয়ে তাঁকে গোপন করা কঠিন। মিঃ মাহেন বলে গেছেন আজ সকালে তিনি এখানে আসবেন। তখনই জানতে পারবেন কিভাবে কাগজ সব ফিরে পাওয়া গেছে।

আমরা মিঃ মাহেন সম্বন্ধে কোন কথা দাদুভাইকে বলবোনা, জানাবোনা সে কথা মনে আছে ত?

মীরা মাথা নাড়িল।

পরের দিন সকাল বেলা।

মিঃ করুণাশঙ্কর গুপ্ত জানালার পাশে চেয়ারে বসিয়াছিলেন। সেখানে রজত ও মীরা আসিল। প্রথমেই বৃদ্ধ মীরাও রজতকে তাহাদের অশ্বারোহণ-পর্বের কাহিনী শুনাইয়া উপহাস করিয়া বলিলেন, তোমরা দেখতে পাচ্ছি দিগ্বিজয়ী হতে চাও।

মীরা হাসিল। রজত হাসিল না। সে গম্ভীর ভাবে এক কোণে দাঁড়াইয়া রহিল।

বৃদ্ধ বলিলেন: ওসব কাগজ-পত্রের কথা মিঃ মাহেন না এলে আলোচনা করবো না। তারপর মীরার দিকে চাহিয়া বলিলেন: মীরা, তুমি বাইরে গিয়ে একটু বাগানে বেড়িয়ে এস।

মীরা একান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও বাহিরে চলিয়া গেল।

মিঃ গুপ্ত রজতকে একখানি চেয়ার দেখাইয়া সেখানে বসিতে বলিলেন। পরে ঈষৎ হাসিয়া কৌতুকপূর্ণ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া কহিলেন:—তুমি আমার কাছে কি জানতে চাও বল?

রজত একটু ইতস্ততঃ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—আপনি ট্রেনে আপনার পরিচয় আমাকে দিলেন না কেন?

ভেবেছিলাম দেবো, কিন্তু তোমাকে ভাল করে জানবার ইচ্ছা আমার হয়েছিল। আমি তোমাকে চেয়েছিলাম জেনে নিতে, তোমার যন্ত্রপাতি, কলকারখানার প্রতি অনুরাগ আছে কিনা? —জান যার যেদিকে ভালবাসা নেই, তাকে সেদিকে টেনে আনা বড় ভুল। মিঃ মাহেন এদিকে অনুরাগী হলেও আমারই রক্ত-মাংসের গড়া একজনকে পেতে উৎসুক ছিলাম, আমার এই কাজের ভিতর। সেজন্যই আমি তোমাকে দেখতে গিয়েছিলাম কলকাতা, কিন্তু হঠাৎ আমার অংশী-দারের সঙ্গে দেখা করবার প্রয়োজন হওয়ায় তাড়াতাড়ি আসতে হলো

দেখ, ভালই হয়েছিল, দৈবক্রমে তোমার গাড়ীতে গিয়ে উঠলাম! আমি তোমাকে আমার পরিচয় ইচ্ছা করেই দিই নাই। তোমার বিরুদ্ধে......

রজতের মুখ লাল হইয়া গেল।

সে কহিল—আপনি মীরার কথা বলছেন? হাঁ বোম্বেতে সে যখন ছিল, তখন তার প্রতি আমি তেমন ভাল ব্যবহার করিনি—সে তখন কথায় কথায় কেঁদে ফেলত! অমন ছিঁচকাদুনে মেয়েকে কেই বা—

মিঃ গুপ্ত বাধা দিয়া বলিলেন—এখন বোধহয়, তোমার আর সে ভাব নেই, কিন্তু আমি ওকে খুবই ভালবাসি! তুমিওত ছেলেমানুষ ছিলে, সে-কথা মনে করবার মত কিছু নয়। তবু তোমার সম্বন্ধে আমার একটা সন্দেহ ছিল, তাই তোমাকে পরখ করে নেওয়া প্রয়োজন মনে করেছিলাম।

বৃদ্ধ কথা বলিতে বলিতে জানালার ভিতর দিয়া একবার বাহিরের দিকে চাহিলেন—প্রসন্ন রৌদ্র-কিরণে চারিদিক উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। মুহূর্ত্তকাল পরে মিঃ গুপ্ত দৃষ্টি ফিরাইয়া বলিলেন: আমি শুনেছিলাম, তুমি, [illegible]ণ্য, অভদ্র এবং হঠাৎ রেগে যাও, এসব শুনে তোমার প্রতি আমার মন বিরূপ হওয়াত অন্যায় নয়, সেজন্যই তোমাকে ভাল করে জানবার জন্য উৎসুক হয়েছিলাম। ট্রেনে উঠবার সময় তুমি আমার প্রতি যে ব্যবহার করেছিলে তাতে তোমার প্রত্যুৎপন্নমতিত্ত্ব, সাহস এবং দৃঢ়তার পরিচয় পেয়ে মনে মনে খুবই খুশী হয়েছিলাম, তখনই গাড়ীর ভিতরে বসে বসে তোমাকে ব্রহ্মদেশে আনবার মতলব ঠিক করে ফেললাম। এই ব্রহ্মদেশ, এদেশের সুন্দর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য তোমার কেমন লাগে, আর যাদুপুরীর কলকৌশল তুমি কিভাবে দেখ, সেকথা জানবারও হয়েছিল আমার একটা আগ্রহ। তারপর মাহেনকে বলেছিলাম, যেন সে এ বাড়ীকে ঘিরে এমন একটা রহস্যের জাল বুনে তোমাকে আরও কৌতূহলি করে ফেলে। তোমার সত্যিকার পরিচয় জানবার জন্যই আমি এ-ব্যবস্থা করেছিলাম।

রজত বলিল: দাদুভাই, তবে আমাকে ব্রহ্মদেশে আসতে নিষেধ করে কেন পত্র দিয়েছিলে?

বৃদ্ধ হা—হা করিয়া উচ্চ-হাস্য করিতে করিতে বলিলেন:—

তোমাকে যদি লেখা হত যে মীরার সঙ্গী হয়ে থাকতে হবে তাহলে কি তুমি আসতে? জান তোমাকে নিষেধ করেছিলাম বলেই তোমার মনের ভিতরকার কৈশোরের নব উৎসাহ ও উদ্দীপনা আর এ্যাডভেঞ্চার তোমাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল এখানে আসতে। মীরাকে আমি সব জানিয়েছিলাম, তোমাকে চিঠি পাঠাবার সঙ্গে সঙ্গেই, তোমার মাকে পত্র দিয়েছিলাম, নির্ভয়ে এখানে পাঠাতে। এখন বুঝতে পেরেছ, এ-সবই তোমাকে জানবারও বুঝবার জন্য করেছি।

তা হ'লে তুমি আমাকে বিশ্বাস করোনি দাদুভাই!

স্নেহার্দ্রকন্ঠে—মিঃ গুপ্ত বলিলেন, মীরার মুখে তোমার প্রশংসা আর ধরেনা, সে তোমায় পেয়ে বেশ মনের আনন্দে দিন কাটিয়েছে। তুমি বাড়ীর চারিদিকটা যে তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান করেছ, সুড়ঙ্গ পথ খুঁজে বের করেছ, তাতে তোমার উপর আমি খুশী হয়েছি। তুমি কিছু মনে করোনা, রজতদাদু, তোমাকে বুঝবার জন্য সকলকে দিয়ে তোমার চারিদিকে এই একটা রহস্যের আবরণ সৃষ্টি করে পরীক্ষা করে চলেছিলাম।

রজত গম্ভীরভাবে কহিল: তোমার কাছে আমি কিছু চাইনে, দাদুভাই, তুমি আমাকে অবিশ্বাস করেছ, আমাকে বোকা বানিয়ে কৌতুক দেখবার চেষ্টা করছিলে! আমি চেয়েছিলাম, সত্যিকার এ্যাডভেঞ্চার। একটা বাচ্চা ছেলেকে ঠকানোর মত একি কান্ড! আমাকে জব্দ করা। না—না আমি কিছু চাইনে তোমার কাছে। আমি একদিনও আর এখানে থাকবো না।

মিঃ গুপ্ত বিস্মিতভাবে অভিমানী রজতের দিকে চাহিলেন। রজতকে কি বলিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় সেখানে মিঃ মাহেন আসিলেন, মীরা বাহির হইতে নাচিবার ভঙ্গী করিতে করিতে একেবারে তাহার দাদুভাইয়ের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

করুণাশঙ্কর মাহেনকে তাহার বোন কেমন আছে সে-কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।

আজ তার অবস্থা একটু ভাল দেখে এসেছি মিঃ গুপ্ত।

বৃদ্ধ এ-সংবাদে সন্তোষ প্রকাশ করিলেন এবং বলিলেন—ঈশ্বর তাকে শীঘ্র রোগমুক্ত করুন এই প্রার্থনা করি। তারপর মিঃ মাহেন ও রজতের দিকে চাহিয়া মৃদু হাস্য করিয়া মিঃ গুপ্ত বলিলেন

রজত আমাকে ভালভাবে নিতে পারেনি মিঃ মাহেন। তবে অভিযোগ এ-কথা বলতে পারি না, কেননা আমি তার সঙ্গে অনেকটা ছলনা করেছি।

' মীরা বলিল:—রজতদা কোন অন্যায়কে সহ্য করতে পারে না। আমি তাকে একদিন সেই পুরানো চেয়ারটাতে আটকে দিয়েছিলাম, তাতে সে ভয়ানক রেগে গিয়েছিল।

আমি কখনো কিছু অন্যায় বলে মনে করতাম না, যদি যাদুপুরীর রহস্য বের করবার মধ্যেই থাকতুম, দরজার কৌশল, মীরার সে ভূতের অভিনয় প্রথমবার আমায় যেমন ভীত ও সন্ত্রস্ত করে তুলেছিল পরে যখন ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার সঙ্গে সব দেখলাম, তখন ভয় বা বিস্ময় কিছুতেই আমাকে দমাতে পারেনি, তবে কি জান দাদুভাই, কিন্তু যদি তুমি আমাকে মারবার জন্য কাকেও লেলিয়ে দেও, তবে সে-অন্যায় আক্রমণকারীকে আমি কখনো ক্ষমা করতে পারবো না! রজত অবিচলিতভাবে দৃঢ়কন্ঠে এই কথাগুলি বলিয়া গেল।

মিঃ গুপ্ত চেয়ারের উপর সোজা হইয়া বসিয়া ধীর ভাবে বলিলেন, তুমি কি বলতে চাও শুনি?

কেন আমাকে সে অন্ধকারে পথের মাঝখানে অন্যায় ভাবে এসে আক্রমণ করেছিল আজও তার সন্ধান পাইনি, যদি তোমার ইঙ্গিতে ওরূপ না হয়ে থাকে, তবে আমার বলবার কিছু নেই,—আর যদি—সে আমার বিশ্বাস করতেও যে লজ্জা হয়, সে কি হতে পারে? এমন দুর্ব্যবহারে কে না উত্তেজিত হয় বলত দাদুভাই! তারপর তোমার আবিষ্কৃত কাগজপত্রগুলির চুরির ভিতর দিয়েও কি আমার ডিটেকটিভ বুদ্ধির কৌশল পরীক্ষা করবার চেষ্টা করেছিলে?

বিস্মিত ভাবে মিঃ গুপ্ত মাহেনের দিকে চাহিয়া বলিলেন—আমরা কি সব পাগল হয়ে চল্লাম নাকি? রজত, কে তোমাকে আক্রমণ করেছিল? আমি কিছু জানিনাত, তারপর কাগজপত্র চুরির কথাত মিথ্যা নয়, কিছুদিন পরে ওদিকে মন দেব ভেবেছিলাম। মিঃ মাহেন বোধহয় রজতের এসব অভিযোগের সত্যিকার উত্তর দিতে পারবে। তুমি কি ঐ কাগজগুলি চুরির কৌশল করে রজতকে গোয়েন্দাগিরি করবার সুযোগ দিয়েছিলে?

মিঃ মাহেন কি যে বলিবেন তাহা যেন ভাবিতে পারিতেছিলেন না। —আমি সত্যিই কাগজ চুরি করেছিলাম, কোন ছলচাতুরি তাতে ছিল না, আমিই রজতকে পথে আক্রমণ করেছিলাম এবং প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিতে চেয়েছিলাম, দেশে ফিরে যেতে।

সকলে মাহেনের কথায় স্তম্ভিত হইয়া গেল।

রজতই প্রথম কথা বলিল, সে মাহেনকে প্রশ্ন করিল,—কেন বলুনত আপনি আমাকে এ-দেশ থেকে তাড়াতে চেয়েছিলেন?

মাহেন রজতের এই কঠোর প্রশ্নের উত্তরে কোন কথা বলিতে পারিতেছিল না।

কিছুক্ষণ পরে মিঃ মাহেন বলিল—মাষ্টার রজত এতদিন পর্য্যন্ত আমি ছিলাম মিঃ গুপ্তের সব কাজের সহায়, কিন্তু তিনি তোমাকে এখানে আসায় বঞ্চিত করতে চেয়েছিলেন আমায় সব অধিকার থেকে, আমি স্বীকার করি যে আমি তোমাকে এ-দেশ থেকে তাড়াবার জন্যই সেদিন আক্রমণ করেছিলাম, কিন্তু তুমি ভয় পাওনি। তোমাকে প্রথম দিন দেখেই আমার ভাল লেগেছিল মাষ্টার রজত, কিন্তু নিজ অধিকার থেকে বঞ্চিত হবার মত সহজ সরল বুদ্ধি আমার ছিল না! এজন্যই শেষটায় তোমাকে জব্দ করবার ভার নিজের হাতে না রেখে মিঃ মংবুর ওপর দিয়েছিলাম তুলে।

মিঃ গুপ্ত বিস্মিত ও স্তম্ভিত ভাবে নির্ব্বাক্ হইয়া বসিয়া রহিলেন। মীরা ত কাঁদিয়াই ফেলিল, সে তাড়াতাড়ি তাহার দাদা-মশাইয়ের কাঁধের উপর মুখ লুকাইল।

মিঃ মাহেন বলিতে লাগিল—মিঃ মংবু বুঝতে পেরেছিলেন, টাকার লোভ দেখিয়ে তিনি আমায় হাত করতে পারবেন। তাই আমাকে তাঁর অংশীদার করতে চেয়েছিলেন তাঁর কারবারের, যদি আমি তাঁকে আপনার আবিষ্কারের গুপ্ত তথ্য সংগ্রহ করে দিতে পারি। আপনার মত দ্বিতীয় শত্রু ত নেই মিঃ গুপ্ত, কাজেই আপনাকে জব্দ করবার জন্য টাকা খরচ করতে তিনি কুন্ঠিত হন নি। আমার সঙ্গে মিঃ মংবুর কথা ছিল যদি ১৮ই তারিখের মধ্যে তাঁকে সব কাগজ-পত্র দিতে পারি তা হলে আমাকে নগদ দশ হাজার টাকা দিবেন। তিনি জানতেন যে আপনি ১৮ই তারিখে এখানে ফিরে এসেই আপনার আবিষ্কারের 'পেটেন্ট' রেজিষ্টার্ড করবেন সরকার থেকে ২০শে

তারিখের ভেতর। ফাদার লগস্‌ডেল এ-সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে পেরেছিলেন বলে মনে হয়। কিন্তু কি করবো কাল আমার বোনের অবস্থা খুব খারাপ হয়ে দাঁড়াল, তাই আমি হতাশ হয়ে পড়লাম, কোন রকমে কাগজ-পত্র সব নিয়ে থিবোতে মিঃ মংবুর সঙ্গে দেখা করতেও পারিনি। কাগজ-পত্র তাঁর অফিসের ভিতরকার একটা ঘরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ফিরে আসবার সময় মাষ্টার রজত আর মীরার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। আজ সকালে মীরার কাছে শুনলুম, আপনি সে-সব কাগজপত্র ফিরে পেয়েছেন।

মীরা অশ্রুভরা চোখে কাঁদ কাঁদ সুরে বলিল—দাদুভাই সে-সব কাগজপত্র মিঃ মংবুর হাতে পড়েনি, রজতদা সে-সব কাগজপত্র ফিরিয়ে এনেছেন।

—বত্রিশ—

অপরাধী কে?

মিঃ মাহেন লজ্জা, ঘৃণা ও অপমানে জর্জ্জরিত হইয়া বিষণ্ণ মনে তার মুখ ঢাকিয়া ফেলিল। —কিছুক্ষণ পরে সে একবার রজতের দিকে মুখ তুলিয়া চাহিয়া মিঃ গুপ্তকে বলিল—ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে আপনি সে-সব মূল্যবান কাগজপত্র ফিরে পেয়েছেন। রজত, মীরা তোমরা কি আমাকে ক্ষমা করতে পারবে না? আমি আমার এ-অন্যায় কার্য্যের জন্য একান্ত লজ্জিত। তোমরা আমাকে ক্ষমা কর—

মীরা মিঃ মাহেনের কাছে আসিয়া তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া মধুর স্বরে কহিল: মিঃ মাহেন, আপনি আমার সঙ্গে সর্ব্বদাই ভাল ব্যবহার করেছেন, যত্ন করেছেন, এ-কাজ যে আপনি ইচ্ছা করে করেছেন সে আমি ভাবতেও পারি নি!

মিঃ গুপ্ত দৃঢ় কন্ঠে কহিলেন—মিঃ মাহেন আমার জমিদারি, আমার ব্যবসায় কি এত ছোট যে, তোমাদের আমি টাকা দিতে পারতাম না! মাহেন, কেন তুমি আমার ওপর নির্ভর করতে পারলে না? —আচ্ছা সে-কথা পরে হবে।

মীরা কাঁদিতেছিল, মিঃ গুপ্ত তাহাকে আদর করিয়া বলিলেন, লক্ষ্মী দিদিমণি, আমার! কেঁদনা, রজত ভাই, তুমি দাদুভাইকে ক্ষমা করো, চমৎকার ছেলে তুমি, তোমার সাহস ও বুদ্ধি কৌশলেই আমার সারা জীবনের সাধনা আবিষ্কারের গোপন তথ্য আমি হারাইনি—শত্রুর হাতে পড়েনি! আমার কাছে কি তুমি থাকবেনা রজত, নেবেনা আমার দান।

রজত দরজার কাছে গিয়া পৌঁছিয়াছিল। দাদুভাইয়ের আহ্বানে আবার সে ফিরিয়া আসিল। রজত ঘরে ঢুকিয়া একবার দাদুর দিকে একবার মিঃ মাহেনের দিকে তাকাইল! মিঃ মাহেন বিষণ্ণ মনে মাথা

নীচু করিয়া একটা চেয়ারের উপর বসিয়াছিল। তাহার দুই চোখ বাহিয়া জল পড়িতেছিল।

রজত আর্দ্র কন্ঠে কহিল, দাদুভাই, মিঃ মাহেন যদি এখানে থাকেন, তবে আমিও এখানে থাকবো!

মিঃ গুপ্তের হৃদয় বিগলিত হইল, তিনি ধীর ভাবে কহিলেন, আমি মাহেনকে এ-বিষয় পরে বুঝিয়ে বলবো।

এক মাস পরের কথা। সকলে মিলিয়া একটা বনভোজনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। বৃদ্ধ করুণাশংকর গুপ্ত ছিলেন এ-বিষয়ের অগ্রণী। তরুণের মত পরম উৎসাহে তিনি বন্ধু বান্ধব ও প্রিয়জনকে লইয়া সমুদ্রের ধারে এক শ্যামল তরুলতায় ঢাকা পাহাড়ের কাছে সকলে মিলিয়াছেন। ভৃত্যেরা চারদিকে তাঁবু খাটাইয়া বসিবার সুন্দর ব্যবস্থা করিয়াছে। সুখাদ্য বিবিধ ভোজনের আয়োজন চলিতেছে। সুগন্ধে, উল্লাসে খেলা-ধুলায় চারিদিকে যেন একটা আনন্দ উৎসবের প্রফুল্ল হাওয়া বহিয়া চলিয়াছে।

মিঃ মাহেন, মীরা, রজত ও অন্যান্য সব পাড়ার ছেলেমেয়েদের সহিত ছুটা-ছুটি দৌড়া-দৌড়ি ও খেলা-ধুলা করিতেছে। ফাদার লগস্‌ডেল মিঃ গুপ্তকে কহিলেন—মিঃ মাহেনকে গত দু' তিন মাস বেশ কাহিল ও বিষণ্ণ দেখাচ্ছিল, আজ যেন বেশ প্রফুল্ল দেখাচ্ছে।

গম্ভীর ভাবে কহিলেন গুপ্ত সাহেব—অনেক আপদ-বিপদের মধ্য দিয়ে ওর দু'টো মাস কেটেছে।

মাহেনের বোনের সংবাদ কি?

সে অনেকটা ভাল আছে, তাকে টোকিয়োতে চেঞ্জে পাঠানো হয়েছে। মিঃ মাহেনও এবার সেখানে যাবে। তারপর একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন—রজত ও মীরা যখন আবার পড়াশুনা করতে যাবে তখন আমি হয়ে পড়বো একলা। শুনলুম রজত দেশে ফিরে যাচ্ছে বললেন-রেভারেন্ড লগস্‌ডেল।

হাঁ, মীরা এজন্য খুবই দুঃখ করছে, তবে সে আবার যখন ছুটিতে আসবে, তখন বোন্‌দের নিয়ে আসবে, মীরার কোন অসুবিধা হবে না!

চমৎকার ছেলে তোমার এই রজত, আমি তার সুন্দর মিষ্টি ব্যবহারে মুগ্ধ হয়েছি। আচ্ছা মিঃ গুপ্ত আপনি কি মিঃ মাহেনের কাছে সব খবর দিয়েছেন?

একটু মৌন থাকিয়া গুপ্ত বলিলেন, হাঁ মিঃ মাহেন যাবেন; মাঝে মাঝে পত্র দিয়ে সব জানাত। কাল মিং মংবুর কাছ থেকে এক অদ্ভুত পত্র পেয়েছি, সে রজতকে একেবারেই পছন্দ করে না, তার অফিস ঘরের জানালা সে ভেঙ্গে এসেছে কাল একটা বিল পাঠিয়েছে। সেই সঙ্গে রজতের কলম কাটা ছুরিখানা সে ফেরৎ পাঠিয়ে দিয়েছে। আপনি জানেন ফাদার লগস্‌ডেল, এ-লোকটা আমার সঙ্গে বরাবর শত্রুতা করে আস্‌ছে। উত্তর দিলেন লগস্‌ডেল সাহেব:-

মিঃ গুপ্ত শুনবেন আমার একটা কথা। এ-বুড়ো বয়সে আর নূতন কিছু কারবার করতে যাবেন না। এই প্রচুর ধনসম্পত্তি এই ভবিষ্যতে ভালভাবে দেখা শোনার সুব্যবস্থা করে ফেলুন আমি সবই জানি মিঃ গুপ্ত মিঃ মাহেনকেও ক্ষমা করুন, হাজার হ'ক ছেলে-মানুষ বইত নয়। প্রলোভনের হাত থেকে ক'জনই বা রক্ষা পায়।

কোন কথা বলিলেন না মিঃ গুপ্ত, শুধু একবার বাহিরের দিকে চাহিয়া ধীর কণ্ঠে কহিলেন—ওই যে ছেলেমেয়েরা সব আসছে।

মীরা হাঁপাইতে হাঁপাইতে দৌড়াইয়া আসিয়া সুন্দর সবুজ ঘাসের উপর ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িল। জান দাদুভাই -মিঃ মাহেন, স্পোর্টে আমাদের সকলকে হারিয়ে দিয়েছেন।

রজত ও মাহেন একসঙ্গে ছুটিয়া আসিয়া ছায়া শীতল গাছের নীচে ঘাসের ওপর দু'হাতের ওপর মাথা রাখিয়া শুইয়া পড়িল। কহিলেন, তা হ'লে মাষ্টার রজত, তোমার এড্‌ভেঞ্চার এবার শেষ হল।

হাঁ ফাদার।

তোমার দাদামশাই তোমায় নিয়ে যে-রহস্যের জাল বুনেছিলেন তুমি সে জাল ছিঁড়ে এক নতুন সাহস ও উদ্যমের পরিচয় দিয়ে আপনাকে মুক্ত করে এনেছ। জীবন-পথে এগিয়ে চলবার সময় এমনি ধৈর্য্য সহনশীলতা ও নির্ভীকতার সঙ্গে চলো, জয় হবে নিশ্চিত!

রজত নীরব রহিল।

ফাদার বলিতে লাগিলেন, তোমার দাদুভাইয়ের কাছে শুনতে গেলাম, তুমি যাদুপুরী ছেড়ে বেশী দিন থাকবে না। তোমাকে ও মীরাকে তিনি চান যাদুপুরীর এই মায়াজালের মধ্যে স্নেহের বন্ধনে বেঁধে রাখতে—আমাদের কিন্তু ভুলোনা মাষ্টার রজত!

রজত সহাস্যে কহিল—যাদুপুরীকে ভুলতে পারবো? এ যে দাদুর হাতে গড়া সত্যিকার যাদুপুরী। তাই আবার ফিরে আসতে হবে বৈ কি? পারি যদি বাবা, মা ও বোনদের সকলকে নিয়ে আসবো। বৃদ্ধ মিঃ গুপ্তের মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল।